আট আনা সংস্করণ

[৭ম গ্রন্থ]

নিরুপমা

(দেড় শতাধিক বর্ষ-পূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস)

[হার-বিজয় (নবন্যাস), শ্রেণীপাঠ্য শিশুবোধ রামায়ণ, শ্রীচৈতন্য-কথামৃত প্রভৃতি প্রণেতা]

শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু

প্রণীত।



৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আষাঢ় ১৩২৪।

প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য
অন্নদা বুক ষ্টল
৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড।

শরৎ বাবুর
নূতন উপন্যাস
অভিমানিনী
(যন্ত্রস্থ)

Printed by
K. C. BOSE at the
STANDARD DRUG PRESS,

প্রীতি—উপহার।

—):০:(—

" রমা যত্র ন বাক্ তত্র, যত্র বাক্ তত্র নো রমা।
বিনয়ো নোভয়ং যত্র সা চ, সা চ, স চ ত্বয়ি ॥"

ভারত-গৌরব, কমলার প্রিয়পুত্র, ভারতীর সার্থক
উপাসক, সর্ব্বথা বঙ্গ-সমাজের আদর্শস্থল
মহারাজাধিরাজ
স্যার্ বিজয়্ চন্দ্ -মহ্‌তাব্ বাহাদুর
কে, সি, এস, আই; কে, সি, আই, ই; আই, ও, এম
বর্দ্ধমানাধীশ্বরের
শ্রীকর-কমলে এই সামান্য প্রবন্ধ
তদনুগৃহীত গ্রন্থরচয়িতা কর্ত্তৃক উপহৃত।



শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আমাদের ।৷০ সংস্করণের ৭ম গ্রন্থ এই "নিরুপমা" প্রকাশিত হইল। সুলভে সৎসাহিত্যের প্রকাশোদ্দেশ্যে এই কাগজের মহার্ঘতার দিনেও আমরা যখন এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই, আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না। এখন শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপা ও সাহিত্য-সুহৃদের স্নেহদৃষ্টি আমাদের এই 'সিরিজে'র অক্ষয় কবচ স্বরূপ হইয়াছে।

"নিরুপমা ও ময়ূরপুচ্ছ"—একসঙ্গেই ছাপা হইতেছিল, নিরুপমা অগ্রে ছাপা শেষ হওয়ায় ৭ম গ্রন্থ ও ময়ূরপুচ্ছ ৮ম গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

পরিশেষে সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন এই 'সিরিজের' নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক হইয়া আমাদের এই 'সিরিজের' ও বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। কাহাকেও **অগ্রিম মুল্য দিতে হইবে না, মাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে** যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভি, পি, ডাকে পাঠাইব, এবং পরে যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে তখন সেইখানি ভি, পি, ডাকে পাঠাইয়া দিব। ইতি—

কর্কট সংক্রান্তি, ১৩২৪।

প্রকাশক।



" দাড়াইয়া, হস্তস্থিত বর্ত্তিকাটী উঁচ করিয়া তুলিয়া ধরিলেন "

নিরুপমা. ৩৬ পৃষ্ঠা।

নিরুপমা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম উচ্ছ্বাস—সুখ-মিলনে।

"আ মরি মরি! কি অপরূপ রূপ! কি সামঞ্জস্য-গঠিত আকৃতি! কি সুন্দর চলন বলন! কি সুমিষ্ট মধুর স্বর! ভূতলে এত রূপ, এমন গড়ন, এ হেন সুন্দর মুখ যে আছে, আমার তো তা জানা ছিল না——"

"দেখো, যেন গ'লে প'ড়ো না! উঃ! এক জন ভিখারিণীকে দেখেই এত; না জানি, কোনো রাজকন্যা কি বড়লোকের মেয়ে হ'লে কি ব'ল্‌তে—কি ক'র্ত্তে ব'ল্‌তে পারিনে।"

"কি ব'ল্লে ভাই—রাজকন্যা? এর চেয়েও কি রাজার বা বড় লোকের মেয়ে সুন্দরী হয় না কি? না, উচ্চবংশে জন্ম নিলেই সুন্দরী হ'তে হয়? সে যা হোক, আজ্ আমি নিতান্তই মোহিত হ'লেম, আজ্ আমার মন প্রাণ একেবারে——"

"তবু ভাল! একবার মাত্র দর্শন দিয়েই একটা ভিখারীর মেয়ে, এত কালের দৃঢ় পণ—স্ত্রীজাতির উপর এমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা—শত শত জমিদার রাজা রাজড়ার উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা—তোমার মন থেকে যে দূর ক'রে দিলে, বাড়ার ভাগ মন প্রাণ হরণ ক'রে যে নিলে—এও একটা পরম সৌভাগ্য! ধন্য এ মেয়েটী! আমরা এ জীবনে যে এ রকম দেখ্‌বো, শুন্‌বো, তার তো ভাই, আশা ভরসা ছিল না!"

রামানন্দ ও ধীরেন্দ্র দুই বয়স্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বন্ধু ধীরেন্দ্রের কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া রামানন্দ বাবু ঘাড় হেঁট করিলেন। এতই অপ্রতিভ হইলেন যে, বন্ধুর শ্লেষ ভাবের কথার উত্তরে একটীও কথা বাহির হইল না। কিন্তু বেশীক্ষণ এরূপভাবে থাকিতেও পারিলেন না। বিস্ময়-পূরিত সতৃষ্ণ-নয়নে সেই অপূর্ব্ব রূপরাশির অধিকারিণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি দেখিলেন? শত-ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিতা, রুক্ষকেশা, মলিন-দেহ', অথচ প্রাতঃ-সূর্য্য-উজ্জ্বল-কান্তি, বিকশিত-পদ্মবৎ-আয়ত-নয়না-, প্রফুল্লমুখী—যেন সদানন্দময়ী এক নবীনা! ঠিক যেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি—যেন রাহুগ্রস্ত মধ্যাহ্ন-রবি—অথবা কর্দ্দমাচ্ছন্ন ক্ষীণ-জ্যোতিঃ হীরকখণ্ড! অমন অন্ন-ক্লিষ্ট দেহ-যষ্টি ও ছিন্ন-বেশ মধ্য হইতে কি-যেন-কি-এক মোহিনী বেশ ধরিয়া, যে দেখিতেছে তাহার চক্ষুকে যেন পলক-শূন্য করিয়া, সেই নবীনা গান গাহিতে গাহিতে

ভিক্ষা করিতেছে। সূর্য্য-কর-মলিন, নবনীত-কোমল, সুগোল এক হস্তে ভিক্ষার ঝুলি, অপর হস্তে স্বরবাঁধা একটী একতারা। মধ্যে মধ্যে তান-লয়-শুদ্ধ মধুর গান। সে গান সত্য সত্যই মনোমোহন, বাস্তবিকই হৃদয়োন্মাদকারী। নবীনা ভিখারিণীকে দেখিলে বোধ হয় যেন পূর্ব্বকালের কবি-বর্ণিত অন্নহীন, ভিখারী, হীনবেশ মহাদেবের পরিবর্ত্তে স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা এই অন্নহীন ভিখারীদের দেশে নিরন্ন সন্তানদের দ্বারে দ্বারে সান্ত্বনাদানচ্ছলে ভিক্ষা করিতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন! নৈলে, একাধারে এত রূপ, এত গুণ, অমন মধুর মিষ্ট হাসি, এমন সুমিষ্ট স্বর কি সহজে দেখা শুনা যায়? কি সুন্দর চক্ষু দুটী! যেন পঞ্চশরের প্রধান দুই শররূপী ভ্রূযুগল শোভিত স্বচ্ছ নীলাম্বু সরোবর! কি সুন্দর চলন! যেন রাজ-হংসী মৃদু-গমনে হিমালয় পাদদেশস্থ মানস-সরোবরে বিচরণ করিতে যাইতেছে! বিধাতা কি অভিপ্রায়ে এমন দেবী-রূপিণী আপাদ-মস্তক-নিখুঁত-সুন্দরী মানবী সৃষ্টি করিয়া ভূতলে পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি বৈ কে বলিবে?

রামানন্দ রায় প্রকৃতই মোহিত হইলেন। তিনি এ বয়সে—কম নয় ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যে—অনেক দেখিয়াছেন, অনেক বাছিয়াছেন; অনেকের কাহিনী শুনিয়াছেন, অনেককে উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এমনটী কৈ আর এ জনমে—বুঝি বা জন্মজন্মান্তরেও—তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হয় নাই। বুঝি, একাধারে অলৌকিক, অসীম,

অতুলনীয় অথচ গর্ব্বশূন্য সরল সৌন্দর্য্য এই নূতন দেখিলেন! বুঝি তাঁর এত দিনের মনো-অভিলাষ আজি পূর্ণ হইতে চলিল—বিধি বুঝি এত দিনের পর প্রসন্ন হইলেন। চির-মুদিত বৈবাহিক ফুল আজ্ যেন কোন্ অমোঘ মন্ত্রবলে প্রস্ফুটিত হইতে চলিল! দেখা যাউক।

* * * * * *

এই ঘটনার পর ছয় মাস কাল অতীত হইয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যেই রামানন্দ বাবুর জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন যে কি, সেটা বুঝাইয়া বলা দুঃসাধ্য! দু এক কথায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভিখারিণী বালার অভিভাবিকা বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট এক প্রধান সৎকুলে তাঁহার জন্ম, অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ, দুর্বৃত্ত নীচাশয় স্বার্থপর জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক ছলে বলে কৌশলে যথাসর্ব্বস্ব হরণ, পরে দূরদেশে নির্ব্বাসন, অনন্যোপায়ে সঙ্গীত সহযোগে স্বাধীন্ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, বিশুদ্ধ পবিত্র রীতি-চরিত্র প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সবিশেষ অনুসন্ধান অন্তে জানিতে পারিয়া বন্ধু ধীরেন্দ্রের পরামর্শমতে রামানন্দ রায় ঐ সুন্দরী বালার পাণিগ্রহণ করিয়া নবপরিণীতা বণিতাকে আপন অট্টালিকায় সংস্থাপন করিয়াছেন। বিবাহ করিতে, এমন কি, স্ত্রীলোক মাত্রেরই মুখ দেখিতে, নিতান্ত অসম্মত ছিলেন বলিয়া ধীরেন্দ্র তাঁহাকে রহস্য করিয়া "যোগানন্দ" বলিয়া ডাকিতেন।

এখন হইতে কিন্তু সে নাম বদল করিয়া "শান্তানন্দ" বলিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, চন্দ্র বংশে কুরু পাণ্ডবের পূর্ব্বপুরুষ শান্তনু রাজা যেমন নিজের অপেক্ষা নীচ বংশোদ্ভবা ধীবর-রাজকন্যা বিবাহ করেন, আপনাদের উচ্চ বংশের মধ্যে অজ্ঞাত-কুলশীলা ভিখারিণীকে বিবাহ-সূত্রে আনয়ন ও স্থাপন করিয়া রামানন্দ রায় তেমনি এই প্রথম বিখ্যাত হইলেন। তদগ্রে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের মধ্যে আর কেহই এমন ভাবে স্বাধীন-পথ-প্রদর্শক হন নাই। ধন-বংশ-রূপ-যৌবন-কুল-শীলগর্ব্বিতা রমণী ছাড়া কেহই ইত্যগ্রে "আনন্দ-কুটীর" সুশোভিত করে নাই! রামানন্দ বাবু প্রথম, তিনিই বুঝি বা শেষ! হায়! বিধির নির্ব্বন্ধ!

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস—পরিচয়ে।

কিন্তু রামানন্দ কে; কি জাতি, কত বয়স; দেখিতে শুনিতে কিরূপ; বাড়ী কোথায়; কোন্ সময়ের লোক? এ সকলের কিছুই এখনো বলা হয় নাই। সুতরাং একেবারে বিবাহিত হইয়া গল্পের নায়ক তিনি, পাঠক পাঠিকার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকেন, এটা নিশ্চয়ই ভাল হয় না। যাঁহাদের জীবনের সকল ঘটনা জানিতে ও পুঙ্খাণুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আরম্ভটা আগে জানা খুব দরকার। আমরা মাঝখান হইতে বলিতেছি বলিয়া সেটা অসম্পূর্ণ রাখিব না। আবার কিন্তু এটাও স্মরণ রাখার দরকার যে, এ জগতে সকলেই বাল্যাবস্থা হইতে লোকের নিকট পরিচিত হয় না; অনেক ভূবিখ্যাত ব্যক্তির বাল্য-জীবন চিরদিন অজানিত থাকে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ হইতে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। পূর্ব্ব রীতির চির প্রথার ব্যতিক্রমে গল্পের প্রারম্ভেই সকলের আগে ভাগে, নায়ক-নায়িকার বিবাহ হইয়া গেল; অনুরাগ, হতাশা, দীর্ঘনিশ্বাস, বিরহ, কবিতা প্রভৃতি পূর্ব্বরাগ-বিহিত অনুষ্ঠান কিছুই হইল না, এটাই বা কি রকম? এমন উপন্যাসে প্রণয়-ঘটিত কোনো কথা না থাকাই উচিত, অনেক বিজ্ঞ সমালোচক একথা বলিতেও পারেন। তাঁহাদের নিকট করজোড়ে ধৈর্য্য-ভিক্ষা ভিন্ন গ্রন্থকারের গত্যন্তর নাই।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

নদীয়া জেলার মধ্যে "আনন্দপুর" অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। এখন কি রকম ঠিক জানি না, আমরা যে সময়ের ঘটনা লিখিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের অনেকেই আনন্দপুরের জমিদার পরমানন্দ রায়কে ভাল রকম চিনিত। একদিকে শিষ্ট শান্তের। ভক্তি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে দুষ্ট পাষণ্ডেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় করিত। তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, শুধু নিজ গ্রামের বলিয়া নয়, আশপাশের গ্রামের ও জমিদারীর প্রজারা পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভয় করিত। লোকে বলিত—পরমানন্দ রায়ের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। তা ছাড়া, তখনকার প্রচলিত সামাজিক নিয়মমত দলাদলির হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা একমাত্র তিনিই ছিলেন বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। "তখনকার প্রচলিত" লেখাতে এখনকার অনেকে সম্ভবতঃ বিরক্ত হইয়া বলিতে পারেন—"এখন কি বঙ্গদেশে এসব নাই?" গ্রন্থকার বলিতেছেন—আছে বৈ কি। তবে, সমাজ মধ্যে ধোপা নাপিত নিমন্ত্রণ বন্ধরূপ শাস্তিদান এখন তেমন বড় একটা দেখা শুনা যায় না—অন্ততঃ অধিকাংশ সুশিক্ষিত গ্রামে নাই! এখন ইংরাজি শিক্ষিত নব্য ভব্য বাবুদের মধ্যে দেশের কর্ত্তৃত্ব-পদ লইয়া যা কিছু কাড়াকাড়ি—ছাড়াছাড়ি—দ্বেষাদ্বেষি—রেষারেষি! দেখা সাক্ষাতে পরস্পরের করমর্দ্দন, মিষ্ট বচন প্রয়োগ—বড় জোর হাত তুলিয়া নমস্কার! অন্তরে অন্তরে কিন্তু ঈর্ষা ফল্গুনদীর অন্তঃশিলা-স্রোত খুব প্রবাহিত! ফল কথা,

সভ্য অসভ্য, ধনী দীন, মূর্খ পণ্ডিত, ইতর, ভদ্র, বালক যুবা, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মধ্যেই—সর্ব্বদেশে—সর্ব্বকালে, একটা-না একটা আকারে এই রকম হইয়া আসিয়াছে, আসিতেছে এবং বুঝি বা এই সভ্যতাভিমানী হতভাগ্য বঙ্গদেশে চিরকাল থাকিবে। যুক্ত পরিবারের মধ্যে অনৈক্যের কথা নাই বা ধরা গেল!

পরমানন্দের পিতা মধ্যবিৎ রকমের গৃহস্থ ছিলেন। তখনকার দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি পুত্রকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসিক ভাষায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সুশিক্ষাগুণে ও নিজের প্রতিভামণ্ডিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে পরমানন্দ রায় অল্পে অল্পে বিশেষরূপ ধন সঞ্চয় ও শেষে জমিদারী পর্য্যন্ত জোগাড় করিয়া সুখে কাল কাটাইয়া যান। তাঁহার যৌবনের মধ্য-সময়ে রাজপুত-কুলতিলক বিখ্যাত যোদ্ধা রাজা মানসিংহ মোগল বংশীয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি হইয়া বঙ্গদেশে আসেন এবং জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দর বনের সন্নিহিত, অধুনা ধ্বংস-প্রাপ্ত "যশোর" নামক নগরের স্বাধীন বঙ্গবীর রাজা প্রতাপাদিত্যকে বিবিধ কৌশলে পরাস্ত ও বন্দীভূত করিয়া দিল্লী লইয়া যান, বঙ্গের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ইহা জ্ঞাত আছেন। প্রতাপাদিত্যকে এরূপে আয়ত্বকরণ পক্ষে অন্যান্য "ভুঁইয়া" জমিদারগণের মধ্যে পরমানন্দ রায় রাজপুত সেনানীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি বিস্তর ধন, হস্তী, অশ্ব—এমন কি নিষ্কর জমিদারী পর্য্যন্ত লাভ করেন

এরূপ সার্থক জনরবও শুনা গিয়াছে। মূল ঘটনাটী যাহাই হউক, ফলে কিন্তু পরমানন্দ রায় অতিশয় চতুর, মেধাবী, জন-প্রিয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। "আনন্দ-কুটীর" নামে নিজের অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কৌশল এবং বিস্তৃত জমিদারীর পাকা বন্দোবস্ত করার সুশৃঙ্খলা দেখিলে তাঁহার অগণ্য প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিত না। দেশ বিদেশে অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, সরোবর খনন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, বিদ্যাচর্চ্চার সুষ্ঠু উপায় সাধন প্রভৃতি নানারূপ উন্নতি করিয়া তিনি রায় বংশের নাম উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। এখনকার আমলের হইলে অনেকের মতন তিনিও যে "মহারাজ"—নিদেনপক্ষে "রাজা-বাহাদুর" উপাধি অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই! কিন্তু তখনকার লোকেরা বেশী সাত্ত্বিক-প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া রাজসিক কি তামসিক ধরণের ভাব তাঁহাদের মনে একেবারেই স্থান পাইত না বলিলেও চলে।

রামানন্দ বাবু এই বিখ্যাতনামা পরমানন্দ রায়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র; কপালদোষে অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন এবং একমাত্র স্নেহশীলা মাতৃস্বসার অসীম যত্নে লালিত ও পালিত হন। কিন্তু অনাথ হইলেও তিনি অভিভাবকহীন ছিলেন না। তাঁহার পিতার আমলের চতুর দেওয়ান কৃপারাম দত্তের বুদ্ধি কৌশল ও ধর্ম্ম-পরায়ণতায় জমিদারী রক্ষা, আয় বৃদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যায়াম-শিক্ষা,

সচ্চরিত্রতা লাভ; দেবদেবীতে অচলা ভক্তি প্রভৃতি প্রাচীন বংশের গুণ সমূহ লাভ করণ পক্ষে তাঁহার কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। অধিকন্তু, তখনকার প্রচলিত উপরিউক্ত তিনটি ভাষা ব্যতীত অল্প স্বল্প ইংরাজিও তিনি শিখিতে পারিয়াছিলেন, রায় বংশের ইতিহাসে ইহা এখনো দেখা শুনা যায়। ইংরাজ তখন বণিক্‌বেশে বাঙ্গালায় নবাগত। এখনকার মতন তখন গ্রামে গ্রামে, জিলায়, নগরে, বিদ্যা শিক্ষার এমন সুগম উপায় ছিল না; এত প্রচুর বিদ্যালয়াদিও ছিল না; ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত লেখা পড়া শিখিয়া নিজ নিজ জাতি-ব্যবসায় ভুলিত না; আর তদ্দ্বারা আপনারা "ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্ট" হইয়া কষ্ট পাইত না বা দিত না। দেশের মধ্যে যাঁহারা সমর্থ অথচ চতুর এবং ইচ্ছুক, তাঁহাদের দুএকজন প্রয়োজন বোধে অধিক অর্থব্যয়ে সুদক্ষ ইংরেজ শিক্ষক রাখিয়া নিজ নিজ পুত্র পৌত্রাদিকে সেই ভাষা শিখাইবার সুযোগ করিয়া লইতেন। কৃপারাম দত্তের পুত্র, প্রথম-উচ্ছ্বাসোল্লিখিত ধীরেন্দ্র, রামানন্দ বাবুর সমবয়স্ক, সম-পাঠী ও সম-প্রকৃতিক; সুতরাং সহজেই তাঁহার সহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই জন্য, স্ত্রী-জাতির প্রতি বন্ধুর আন্তরিক ঘৃণা এবং বহু স্থান হইতে আগত অগণ্য বিবাহ-সম্বন্ধ উপেক্ষারূপ গোপনীয় কথা তাঁহার কিছুমাত্র অগোচর ছিল না।

'বিদ্বৎ-জনোৎসাহী, দেব-দ্বিজ-ভক্তিমান, অসাধারণ' 'ধর্ম্মবুদ্ধি-বিদ্যাশালী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সময়ে নদীয়ার রাজসিংহাসনে

আসীন। ইতিহাস-বর্ণিত অল্পবয়স্ক নব্য যুবা মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বঙ্গ-লক্ষ্মী সবে মাত্র পাশ্চাত্য বণিক ইংরেজের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন! সুতরাং এ সময়ে চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা, লুটপাট, মার ধর, গৃহবিচ্ছেদ! সকলেই নিজ নিজ ধন সম্পত্তি, পরিবারবর্গ, মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে ব্যতিব্যস্ত। ইংরেজ সিংহাসন লাভ করিলেও কার্য্যতঃ দেশটী তখনও রীতিমত সুশাসিত হইয়া উঠে নাই। এই গোলযোগের সময় সুবুদ্ধি দেওয়ান কৃপারাম দত্ত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আর দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, নদীয়ারাজের সহিত নিজ প্রভু-পুত্রের সৌহার্দ্দ্য অধিক মাত্রায় বাড়াইয়া দিলেন। তরুণ-বয়স্ক রামানন্দ রায়ের কমনীয় রূপ, অসীম গুণ, প্রখর বুদ্ধি, সুন্দর শিক্ষা ও বয়সাধিক ধর্ম্মবুদ্ধি দর্শনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অতীব প্রীত হইয়া প্রায়ই নিজ নগরে—সময়ে সময়ে—অন্যত্র গমন কালেও তাঁহাকে আপনার কাছে কাছে রাখিতেন; যখন যেখানে যাইতেন পারতঃ পক্ষে সঙ্গছাড়া করিতেন না। এই রাজ-সংসর্গ-সংঘর্ষে রামানন্দ রায়ের যে সর্ব্বরূপ উন্নতি লাভ হইয়াছিল, সকলেই এটা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিখ্যাত রাজধানী কৃষ্ণনগরে অবস্থান সময়ের একদিন বন্ধুসহ ভ্রমণকালে, যেরূপে নিরুপমা রামানন্দের নয়নগোচর হয়; এবং পরিশেষে তাঁহাদের যে বিবাহ পর্য্যন্ত হয় তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিবরিত হইয়াছে।

আর নিরুপমা কে? শাপ-ভ্রষ্টা দেব-রমণীর মতন অনন্ত-রূপগুণশালিনী, প্রফুল্ল-বদনা, সঙ্গীত-পরায়ণা এই বালা কোথা হইতে কৃষ্ণ নগরের রাজ-পথে ভিক্ষা করিতে আসিল? আসিয়া, শুধু একবার মাত্র দর্শন দানে; চিরদিনের মতন রামানন্দের মন প্রাণ কিসে হরণ করিল? অমন নিখুঁত সুন্দরীর নাম আগে "মলিনা" রাখাই বা হইয়াছিল কেন? এ সকল কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে গ্রন্থকার নিতান্তই অপারক। যে বিষয় ইতিহাসে নাই, অন্যান্য অনেক বর্ণনীয় বিষয়ের মতন যাহা এ পর্য্যন্ত সুলেখকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাহা কল্পনাতে পরিণত করিয়া তৎসম্বন্ধে যেমন-তেমন-একটা পরিচয় দেওয়া, বা, যাহা-হউক-কিছু লেখা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে যতটুকু সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে, রূপে গুণে কুলে শীলে কোনো অংশেই নিরুপমা রামানন্দের অননুরূপ ছিলেন না। নচেৎ, তখনকার দিনে,—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্বাধীনে—রামানন্দ বাবুর বিবাহ এত সহজে নির্ব্বাহিত বা সমাজে অনুমোদিত হইত না। আর সুন্দরীর "মলিনা" নাম রাখা নূতন নয়। এখনও—এই উন্নত, সুসভ্য, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—অনেক ধাড়ীর রাঙা টুকটুকে মেয়েকে কত লোকে "ভূতী" "টেঁপী" "পুঁটী" "খেঁদী" প্রভৃতি নামে ডাকে। ছেলে মেয়ের মা হইলেও তাদের ছেলেবেলার সে "ডাক নাম" ঘুচে না! সুতরাং গ্রন্থকারের এ ত্রুটী পাঠক

পাঠিকাগণের মার্জ্জনীয়। তবে বিবাহের পরে অন্য সকল রকম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে "মলিনা সুন্দরী" নামের "নিরুপমা" পরিবর্ত্তনও যে ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিতে সঙ্কোচ হইতেছে না; অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে, যে রকম দেখা শুনা যাইতেছে তাহাতে এ রমণী "নিরুপমা" বটে!

তৃতীয় উচ্ছ্বাস—শিক্ষা-সহবাসে।

বিবাহ করিয়া রামানন্দ রাঙা বৌ ঘরে আনিলেন, "আনন্দ কুটীর" এত দিনে প্রকৃতপক্ষে আনন্দে পূর্ণ হইয়া বহুদিন পরে নিজ নাম সার্থক করিল। সকলেই নববধূর অতুলনীয় রূপে গুণে মোহিত হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। যাহারা নিরু-পমাকে ভিখারিণী বেশে প্রথমে দেখিয়াছিল, নানালঙ্কার-ভূষিতা, সুকেশা, সুবেশা, মৃদু-গতি নবযুবতীকে এখন সৌধ অট্টালিকার উপর হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারিত কিনা সন্দেহ; যাহারা একবারও দেখে নাই তাহাদের তো কথাই স্বতন্ত্র। তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী পূর্ব্বের মতনই ছিল, বরং প্রাকৃতিক নিয়মের বশে কোনো কোনো বিষয়ে যেন কোথাও বা উজ্জ্বলতর, আবার কোথাও যেন একটু আধটু পরিবর্ত্তনও হইয়াছে! ঠিক যেন জন-মনোহর শরতের রাকাকিরণ একখানা পাতলা মেঘে এক একবার ঢাকা পড়িতেছে; আবার ক্ষণেকেই প্রকাশিত হইতেছে। আগেকার চঞ্চলগতি এখন ধীর পাদক্ষেপে পরিণত হইয়াছে—বিবাহ বাসর হইতেই বুঝি চপলা বালা গাম্ভীর্য্য শিক্ষা করিতে শিখিয়াছেন! যে কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর স্বর স্বভাব-জাত সুকণ্ঠ বন-পক্ষীর রবকেও হারাইয়া দিত; যে কণ্ঠের মানসোন্মাদকারী গানে মোহিত হইয়া পাষণ্ড কৃপণও কিছু-না-কিছু ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিত না, সেই অনুপম স্বর যেন নিজ স্বভাব ছাড়িয়া এখন একটু করুণ রসাশ্রয়

করিয়াছে! মুখের কথাতেও এখন আর তখনকার মতন খৈ ফুটে না! যার তার সঙ্গে, যখন তখন, যেখানে সেখানে, যে সে কথা বড় একটা এখন আর বাহির হয় না,—সকল কথাই এখন মৃদু, স্বল্প, আর যেন অন্তস্তল-নিঃসৃত, বুঝি বা ভেবে চিন্তে বলা।

কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন হঠাৎ কিসে হইল? শুভ সংমিলনের বর্ষ সবেমাত্র পূর্ণ, এরির মধ্যে কিসে এ অঘটন ঘটনা ঘটিল? সত্যই কি স্পর্শমণির পরশে কঠিন লোহা সোণা হইয়াছে? না, কোনো অপার্থিব দ্রব্য সংস্পর্শে খাঁটী সোণা লোহারূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে? কোন্‌টী ঠিক তা কে বলিবে? সময়—বিধাতার সেই আশ্চয্য বিধান—সেই অকাট্য পরিমাণ-যন্ত্র, এ রকম যে করিয়াছে এটা সুনিশ্চিত। সময়ের স্রোতে সকলকেই ভাসিতে হয়, সময়ই সব করে, কালই সব বলে! তবে এখানেও কেন না করিবে, কেন না বলিবে? কবি যথার্থই বলিয়াছেন:—

নদী, শর, তারকা, চঞ্চলা, সমীরণ।
করা যায় এসবার গতি নিবারণ॥
কিন্তু ওহে সময়-বিহঙ্গ চমৎকার!
কিছুতে নিবার্য্য নয় গমন তোমার!

নিরুপমাকে বিবাহ করার পূর্ব্বে রামানন্দ বাবু তাঁহার অলৌকিক অসীম অপূর্ব্ব রূপরাশি দর্শনেই মুগ্ধ হন, একথা অগ্রেই

উক্ত হইয়াছে। রূপের সঙ্গে তদনুরূপ গুণসমূহ আছে কি না; বহু কষ্টে আহরণ করিয়া যে রত্ন বক্ষে ধারণ করিলেন, সেটা সাচ্চা কি ঝুটা; প্রকৃত হীরা না স্বচ্ছ শুভ্র কাঁচ খণ্ড মাত্র; সেটা অমৃত ফল কি মাকাল ফল, সেটা দেখার অবসর বা প্রবৃত্তি তখন তাঁর হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বিজ্ঞতর ধীরেন্দ্র এসম্বন্ধে এক আধবার আভাস ইঙ্গিত করিলেও প্রেমোন্মত্ত রামানন্দ বাবু সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু এখন দেখিলেন, দেখিয়া বুঝিলেন যে, পথ হইতে কুড়াইয়া-পাওয়া ভিখারিণীকে বিবাহ করা তাঁহার মতন উচ্চপদস্থ গৌরবান্বিত লোকের পক্ষে ভাল কাজ হয় নাই—বন্ধু বান্ধবের নিষেধ উপেক্ষা করার ফল তাঁহার ভাগ্যে সত্ব ফলিয়াছে! তিনি কল্পনার তুলিতে মনে মনে যে আদর্শ-নারী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন; যে নারী না পাইলে, বরং চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবেন সেও ভাল, এমন দৃঢ় সংকল্প ও অটুট পণ মনে মনে ছিল; যে নারী স্বধু নামে বিবাহিত নন, কাজে তাঁহাকে যন্ত্রচালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ সকল রকমে চালাইয়া লইয়া বেড়াইবেন, তাঁহার সকল আপদ বিপদে মন্ত্রী, সকল কাজে পরামর্শদাত্রী, প্রতি পাদবিক্ষেপে সহায় হইবেন, এ সে রমণী নয়। তাঁহার সৌভাগ্য-ক্রমে প্রবল ক্ষুধার সময়ে অযাচিতরূপে আহার্য্য মিলিল বটে, কিন্তু এ খাদ্য যেন খুবই দুষ্পাচ্য। ঘোর পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ শীতল বলিয়া সে পানীয় পাইলেন, সে জলতো সুস্বাদু প্রাণ-শীতল-কর

পেয় নয়—সে বুঝি ক্ষুদ্র ডোবার উত্তপ্ত কর্দ্দমাক্ত জলের অবশেষ মাত্র ; অথবা সদ্যো-আহরিত রবিকর-তপ্ত নারিকেল-বারি। মোটের উপর এ সকল কথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, নিরূপমা দেবী ভালবাসার আব্‌দারে বা বাড়াবাড়িতে কখনো নিজ পতিকে বিরক্ত ত্যক্ত করিতে জানিতেন না। স্বামী যে সকল সৎযুক্তি দেখাইতেন, বা যে সকল সৎকথা বলিতেন, নিতান্ত নিরীহের মতন তিনি সে সব মন দিয়া শুনিয়া যাইতেন ; সময়ে সময়ে এত গম্ভীর হইতেন, যে, তাঁহার স্বামী পর্য্যন্ত তাহাতে আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া যাইতেন, যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না।

তবে কি নিরুপমাতে স্বধু রূপই ছিল, কোনো গুণ ছিল না ? তিনি কি স্বধু রূপেই নিরূপমা, গুণে কি তিল মাত্র এই আখ্যা সার্থক করিতে পারিতেন না ? পারিতেন বৈ কি ; রূপের অনুরূপ গুণও তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে সমস্ত গুণ স্বামীর চক্ষে বিশুদ্ধ নয়, সে সকল যেন কর্দ্দম-প্রস্তর-নিকৃষ্ট-ধাতু-মিশ্রিত নবোত্তোলিত খণিজ সোণা ! স্নেহ, দয়া, বদান্যতা, ভালবাসার সঙ্গে সকল বিষয়ে অজ্ঞতা ; কি-এক-রকম নূতনতর আচার ব্যবহার ও চঞ্চলতা ; কোমল বয়স হইতে ইতর-সংসর্গ-বাস-জনিত নীচ স্বভাব যেন তাঁহার প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায়, প্রতি আচরণে প্রকাশ পাইত—নিদেন রামানন্দ বাবু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে এমনি এক একটা ভাব যেন দেখিতে পাইতেন। কেমন করিয়া বন-বিহারী পক্ষীর

স্বর অনুকরণ করিতে হয়, ; বন্য ছাগ বা মৃগ কিরূপে দৌড়িয়া যায় ; রাগ বা বিবাদ সময়ে ইতর জাতীয় লোকে কিরূপ অঙ্গ ভঙ্গী করে, নিরুপমা যেন এই সকলই ভাল জানিতেন ; আর সঙ্গিনীগণকে অনুকরণ দ্বারা দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু কি রকমে গৃহকর্ম্ম করিতে হয়, সুন্দররূপে ঘর বাড়ী সাজাইতে পারা যায়, ঘরের কোথায় কোন্‌টা রাখিলে ভাল মানায়, কাহার্ সঙ্গে কি রকমে কথা কওয়া উচিত ; কাহাকে লজ্জা করিলে ভাল দেখায় ; দাস দাসীকে কি কৌশলে শাসন করিয়া বশে আনিতে হয়, এ সব এবং গৃহিণীর করণীয় অন্যান্য বিষয় তো কৈ নিরুপমা কিছুই জানেন না ! হায় রে ! কবে আর শিখিবেন বল দেখি ? তা ছাড়া,— বেশভূষা, পড়াশুনা, গানবাদ্য, স্বাধীন ভাবে স্বামী সহ হাস্য পরিহাস প্রভৃতি তাৎকালিক অল্পবয়স্কা নারীজন-সুলভ গুণ তাঁহার জীবন-নাট্যে ঈশ্বর যেন লিখিয়া দেন নাই। এর চেয়ে উত্তর পাড়ার মুখুয্যেদের মেয়ে মাধুরী কি শত গুণে শ্রেষ্ঠ নয় ? রূপে না হয় একটু খাটো—নিরুপমার কাছে দাঁড়াইলে হয়তো মাধুরীকে মলিনা দেখাইত ; কিন্তু রূপ গুণ সব বিষয় একত্র ধরিয়া তুলনা করিলে মাধুরী নিরুপমা অপেক্ষা নিশ্চিত অনেক শ্রেষ্ঠ। রামানন্দ অনেক সময় নির্জ্জনে ভাবিতেন—হায়, কেন তিনি এতদিন মাধুরীকে নিদেন দু একবার ভাল রকমে দেখিয়া, তাহাকেই বিবাহ করেন নাই, কেন তাহার পিতার শত উপরোধ তিনি তখন উপেক্ষা

করিয়াছেন! কিন্তু এত ভবিষ্যৎ-ঘটনা জানা মনুষ্যের সাধ্য নয়। জানিতে পারিলেও অদৃষ্টের উপরে বা কাহার্ কতটুকু হাত আছে? তিনি সামান্য মানুষ বৈতো নয়; ভাল বাছিতে গিয়া মন্দ পাইবেন, ইহা কিরূপে জানিবেন? অমৃত খাইতে গিয়া গরল ভক্ষণ করিলেন, এটা নিজের ভাগ্যদোষে নয়তো কি?

নিরুপমার নামের সার্থকতা করিতে—প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে উপমা-রহিত রাখিতে—রামানন্দ রায় চেষ্টার কসুর করেন নাই। যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, এখনকার মত স্ত্রীশিক্ষা-প্রথা তখন বঙ্গদেশে তেমন খুব বেশী প্রচলিত না হইলেও—"পাস-করা মেয়ে" বাজারে ছড়াছড়ি না থাকিলেও, অবস্থাপন্ন লোকেরা আপনাপন স্ত্রী কন্যাগণকে অন্তঃপুর মধ্যেই সুশিক্ষিত করিতে, সুতরাং "কন্যা এব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" রূপ মনুর এই উপদেশ-বাক্য সার্থক করণে ইতস্ততঃ করিতেন না। সংবংশজাত স্ত্রীলোক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, খুঁজিলে বিস্তর এরূপ দেখা যাইত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিতের অভাব ছিল না। নিরুপমাকে ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য রামানন্দ সেখান হইতে একজন বিজ্ঞ বয়ঃস্থ পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। তাঁহার পিতার সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর পীতাম্বর পালকে, চিত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে জনৈক খ্যাত-নামা "ওস্তাদ-"কে সঙ্গীত শিখাইবার উদ্দেশে আনন্দপুরে আনাইলেন।

কিন্তু সকলই বৃথা হইল! এ বই, সে বই, দুচার পাতা পড়িয়া নিরুপমার পাঠ শেষ হইয়া গেল। অনিচ্ছুক ছাত্রীকে বৃদ্ধ শিক্ষক কিছুতেই আঁটিতে পারিতেন না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে ছাত্রী লেখা পড়ার উপকরণ সকল ইতস্ততঃ ফেলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিত! চিত্র-বিদ্যা-শিক্ষক কিছু আঁকিতে দিলে কতক একটু একটু আঁকিয়া নিরুপমা হয় সে সব ছিঁড়িয়া ফেলিত; না হয় তুলি ভাঙ্গিয়া, রং ফেলিয়া, পাঠ-গৃহ ছাড়িয়া অন্দরের ভিতর-বাড়ীতে পলাইয়া যাইত! আর নয়তো শিবমূর্ত্তি আঁকিতে বানর আঁকিয়া বসিত! সঙ্গীতের শিক্ষক বহু-গুণজ্ঞ প্রাচীন ওস্তাদজী "সা রে গা মা" সাধিতে বলিলে "ওমা, এসব কি গো?" বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাস্যের তুফান তুলিত; রাগ রাগিণীর বিবরণ এবং ইতিহাস সংক্ষেপে বুঝাইয়া বেহাগ গাহিতে বলিলে ললিত রাগিণী আনিয়া বসিত; মধ্যমান বাজাইতে দিলে একতালা চড়াইত। সে যে এক সময়ে উত্তম-সঙ্গীতজ্ঞা বলিয়া বিখ্যাত ছিল—বিবাহের অগ্রে সঙ্গীত সহ ভিক্ষা-বৃত্তিই যে তাহার জীবনোপায় স্বরূপ পরিগণিত হইত, এটা কেন সকলে ভুলিয়াছেন; যেন এইটী শিক্ষা দিয়া সকল ব্যক্তিকে অপ্রতিভ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এমনি বোধ হইত। অথচ, প্রকৃত পক্ষে, কঠিন সঙ্গীত-বিদ্যা-শিক্ষা তাহার আদৌ হয়ই নাই, এর-ওর-তার কাছে প্রচলিত সামান্য গীতবাদ্য তাহার চরম শিক্ষা ছিল;

ভগবৎ-প্রদত্ত মধুর কণ্ঠস্বর না থাকিলে তাহার গান কোনো ভদ্র-লোকের গ্রাহ্য হইত কিনা সন্দেহ, এটা খুব সহজেই অনুমেয়। রামানন্দ বাবু নিজে বসিয়া থাকিয়া বিবিধ যত্ন সহ ঐকান্তিক চেষ্টা করিলেও কোনো বিশেষ ফল হইত না। সেতারের কাণ মুড়িতে গিয়া• কি-জানি-কি-রূপে নিরুপমা তার ছিঁড়িয়া ফেলিত; বেহালা বাঁজাইতে আরম্ভ করিয়াই ছড়ি গাছটী ভাঙ্গিয়া বসিয়া থাকিত! আবার শিক্ষকেরা প্রাচীন-বয়স্ক হইলেও স্বামীর সম্মুখে তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া নিরুপমার পক্ষে যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত—আগে যে, সে সকলেরই সম্মুখে বাহির হইত—ওঃ! সে সকল যে আলাদা কথা গা! রামানন্দ বিরলে কত বুঝাইতেন, কতবার মিনতি করিতেন, কত কত ভয় মৈত্রী দেখাইতেন। কাজে কিন্তু কিছুই বেশী ফল হইত না। সে সময় নিরুপমা অধোমুখে ঘাড় হেঁট করিয়া স্বামীর পায়ের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত। কখনো কখনো—বাগানে হইলে ফুটন্ত ফুলের পানে; রাত্রি হইলে আকাশের চন্দ্র তারকার দিকে—অন্যমনস্ক ভাবে দেখিয়া দেখিয়া একটা অন্তস্তল-বহির্গত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত। কিন্তু স্বামীর কথায় তর্ক বিতর্ক করা, তাঁর সঙ্গে কোনো রকম বচসা, কি, কেন এমন করিয়া উদাসভাবে পাঠে অবহেলা করে তার কারণ বলা, এর একটাও একদিন ঘটে নাই। সে সময় নব দম্পতিকে দেখিলে ঠিক এমনি বোধ হইত যেন পাঠ-ভীত

শিষ্য গুরুর নিকট পাঠ-শিক্ষা করিতেছে ; তাই এমন অচল অটল ! রামানন্দ নিজে কিছু শিখাইবার যত্ন করিলে একই রকম ব্যাপার হইত। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিরুপমা হয় ঘুমাইয়া পড়িত ; না হয়তো প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তির মতন নিশ্চলভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে অবোধ বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিত। অথচ, অন্তঃপুরে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণকে আহার দিতে, পোষা কুকুর বানরের সঙ্গে খেলা করিতে, খিড়কীর বাগানে বেজির গলার শিকল খুলিয়া দিয়া আবার তাহাকে দৌড়িয়া ধরিতে, সরোবরে হাঁস ছাড়িয়া দিয়া যেন বাজি রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিতে, নানা রকমের ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে, বয়স্যা প্রিয় সহচরীদের সঙ্গে নানারূপ পরিহাস এবং রঙ্গ ভঙ্গ করিতে, হাসি-হাসি-মুখে কেমন অদ্ভুত পটুতা দেখাইত ! কেবল, কোনো রকম চিন্তার কাজ বা কিছুতে নিজের বুদ্ধি পরিচালন, কি কোনো একটা ভাল বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন কেন যে করিত না, তাহা কে বলিবে ? বোধ হয়, তিনি মনে মনে ভাবিতেন ও সকল পুরুষের কাজ—ওমা ছি ছি, ও সকলে মেয়ে মানুষের সম্পর্ক কি ? পাড়ার দু এক জন, কি সহরের অনেক স্ত্রীলোক এ সব করে সত্য বটে ; কিন্তু যারা করে, তাদের বাপু মেয়ে-মর্দ্দানি ! যা বল, যা কও, নিরুপমা কোনো রকমে সে সকলে মিশতে মিশতে চায় না—পার্ব্বেও না, এতে যা থাকে তার কপালে !

চতুর্থ উচ্ছ্বাস—চিন্তা-সাগরে।

ভাবুক ও দার্শনিক মহলে এক্ষণে এই রকম একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে "তবে কি নিরুপমার মনে কোনো রকম চিন্তাই ছিল না? সে কি নিতান্ত নিশ্চিন্ত-ভাবে, সরল-মনে, বালিকার মতন হাসি-হাসিমুখে সকল কাজ করিত, বা সকলের সঙ্গে বেড়াইত? মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী কিম্বা অন্য কোনো নিকট-আত্মীয় তাহার কেহই ছিল না; বিবাহিতা হইয়া উদরান্নের চিন্তা এক রকম মিটিয়া গিয়াছে; মাতার মতন স্নেহশীলা প্রাচীনা ধাত্রী সম্প্রতি রামানন্দের নিকট-আত্মীয়াগণের সঙ্গে কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে তীর্থ করিতে যাত্রা করিয়াছে; প্রার্থনাধিক, আশাতীত, অলৌকিক রূপগুণ-ধন-সম্পন্ন পতি লাভ করিয়া নিরুপমার সংসারের সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তবে আর কি—আবার কিসের চিন্তা? কিন্তু চিন্তা ছিল বৈ কি! এ সংসারে চিন্তাশূন্য কে? এক-রকম-না-এক-রকম ভাবনা সকলের মনে আছেই আছে! আছে বলিয়াই বুঝি মধ্যে মধ্যে—প্রায়ই—কি-একটা গাঢ়-চিন্তা, কে জানে কেন, সুনীল প্রাতর্গগনে এক খণ্ড কাল মেঘের মত তাহার মনাকাশে উদিত হয়। হইয়া, গোপন থাকে না—অমল বিধুবদনে প্রকটিত হয়; অনিন্দ্য-সুন্দর মৃগ-নয়ন-দ্বয়ে সময়ে সময়ে দু'একটী মুক্তাফল ধারাকারে প্রবাহিত করে; পদ্ম-কোরক সম উচ্চ বক্ষঃস্থলকে সময়ে সময়ে, বুঝি বা কারণ অকারণে,

স্ফীত এবং এখনো-বালিকাবৎ টুক্‌টুকে ঠোঁট দুটীকে যেন অভিমান-ভরে ঈষৎ কম্পিত করে! শেষে সকলের পরিণাম স্বরূপ একটা খুব দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হয়? ইহার একমাত্র অনুমিত কারণ—রামানন্দ বাবু আর আগেকার মতন নিরুপমাকে তেমন বেশী ভালবাসেন না; তেমন যত্ন, তেমন আদর, তেমন সোহাগ, ততটা মিষ্ট সম্বোধন, আগেকার মতন তেমনি বিনা ছল-ছুতায় নিষ্কারণ দেখা সাক্ষাৎ, তাগাতাগি ডাকাডাকি মাখামাখি আর এখন নাই। এখন যা কিছু সে সব যেন লোক-দেখানে, যেন না করিলে নয় তাই করা, না বলিলে নয় তাই বলা, না শুনিলে বা না শুনালে নয় ঠিক যেন তাই শুনা বা শুনানো। কথায় কিছু না বলিলেও, তাঁর প্রতি-কাজে নিরুপমা যেন অনাদরের ভাব দেখিতে পান—প্রেমিকের কাজ প্রেমাধীনের নিকট কতক্ষণ অজ্ঞাত থাকে? নিরুপমা এটা নিশ্চিত রকম বুঝিয়াছে; অমলা বিমলা সহচরীদ্বয় ছেলে মানুষ, তারা কি জানে? প্রেমের ধার তারা কি ধারে? এ সকল বুঝা কি যার তার কর্ম্ম? তা হ'লে ভাবনা ছিল না।

আবার সকল জ্বালার উপর বিষম একটা নূতন ধরণের উৎপাত তাহাকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। ও-পাড়ার মুখুর্য্যেদের বাড়ীর মাধুরী নামে, সেই মেয়েটা এত ঘন ঘন রায়-বাড়ীতে যাতায়াত করে কেন? বিবাহ করিয়া নিরুপমাকে ঘরে আনার পর, দিন কতক—বুঝি বা রাগে কি অভিমানে—মাধুরী

বড় একটা যাওয়া আসা করে নাই। এখন, এমনতর ভাবে, রোজ রোজ, যখন তখন, সময় অসময়ে, কাজে অকাজে, ছলছুতায় আসে যায় কেন? তার নিজের সঙ্গে মাধুরীর বিশেষ সম্প্রীতি নাই; বাড়ীতে অন্য সমবয়স্কাও কেউ তেমন নেই। তবে কার্ কাছে, কিসের জন্যে, সে এত ঘন ঘন আসা যাওয়া করে? অবিবাহিতা বয়ঃস্থা মেয়ের পক্ষে—হ'লোই বা কুলীন বামুনের মেয়ে—এটা ভারি দূষ্য কাজ, জেনে শুনেও তার মা বাপ পাঠায় কেন? আগেকার চেয়ে এখনকার এরকম করাটা কি ভাল? তা ছাড়া, সুযোগ পেলে, এদিক্ ওদিক্ দেখে শুনে, বাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে রঙ্গভঙ্গী হাসি তামাসা করে, পানটান দেওয়া নেওয়া চলে, এ সবই বা কি রকম? সামাজিক প্রথা বা চাল চলন সম্বন্ধে নিরুপমার বিশেষ অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না সত্য। কিন্তু এটা সে খুব বুঝিতে পারিত যে, তার স্বামীর সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করার মতন একটা দূর-সম্পর্ক থাকিলেও, ও রকম ব্যবহার করা মাধুরীর পক্ষে কখনো উচিত নয়, বরং নিতান্তই গর্হিত!

মাধুরী সুন্দরী, এটা নিরুপমা বিশেষরূপে দেখিয়াছে। তার নিজের চেয়ে সে বেশী সুন্দরী নয় বটে—কেননা, কথাটার সঠিক মীমাংসা করিতে, পরস্পরের তুলনা দিতে, অমলা বিমলার কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিরুপমা নিজের মুখ দুএকদিন দর্পণে দেখিয়া ঠিক করিয়াছে যে, সে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলে, যেন গোলাপের

কাছে মল্লিকার মতন, সূর্য্যের কাছে চন্দ্রের মতন, অথবা রাজ্ঞীর নিকট সুন্দরী সহচরীর মতন, মাধুরীকে দেখায় বটে। কিন্তু হইলে কি হয়? মাধুরী ঠাকুরাণীর মতন সুন্দর চলন বলন, মধুর হাবভাব, বিলোল কটাক্ষ, মনোহর কথার বাঁধুনি, গৌরবপূর্ণ শ্রেষ্ঠতর একটা ভাবভঙ্গী, উচ্চ বংশের গরিমা আর কয় জনের আছে? একথা আবার যেমন-তেমন-ভাবে দেখাশুনা নয়, যার-তার মুখের শোনা কথা নয়, তা হ'লেও বা না হয় কতকটা অবিশ্বাস করা যেতো। স্বয়ং রামানন্দ বাবু এ সকল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। করিয়া, গৌরবের সহিত—কেমন সুখ্যাতি ভাবে—নিজ মুখে—পত্নীর নিকট স্পষ্ট কথায় কত দিন বলিয়াছেন। নিরুপমা চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত অবিশ্বাস করিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু যে কোনো বিষয়ে হউক না কেন, রামানন্দের কথায় অবিশ্বাস—হরি! হরি! এ প্রাণ থাকিতে তো নয়! রামানন্দ যা বলেন, নিরুপমার কাছে তা বেদ-বাক্য; যাহা করেন, তাহা গীতা-শাস্ত্র—অন্যের অবশ্য-অনুকরণীয়। যা যা বুঝান, সে সব অকাট্য, তার চেয়ে এ জগতে কেহই ভাল বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন না। ধন্য প্রেম! এ জগতে তোমার ক্ষমতাই সকল রকমে শ্রেষ্ঠ! যেহেতু, অন্ধ বিশ্বাসের ভরে ইহাতে নিজের চক্ষু কর্ণকেও লোকে—হায় রে! অবিশ্বাস করে!

পঞ্চম উচ্ছ্বাস—কর্ত্তব্য-পালনে।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। জগতের সৃষ্টিকাল হইতে যেমন দিন আসে যায়, রামানন্দ-নিরুপমার বিবাহিত জীবন আরম্ভ অবধি সেইরূপ আসা যাওয়া করিতে লাগিল। আসার চেয়ে যাওয়াটাই বুঝি এ জগতে লোকের বেশী লক্ষ্য হয়, তাই বুঝি দিন এক রকমে কাটে, রা'ত্ আর যায় না। নবজীবনের নূতন দিন বুঝি আর উদয় হয় না—সূর্য্যের উদয় বুঝি এতই দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ।

নিরুপমার রূপের অনুযায়ী গুণ নাই, বা প্রয়োজনীয় স্বামীর সকল রকম কথা তিনি শুনেন না বলিয়া যে রামানন্দ তাঁহাকে তেমনটা ভাল বাসেন না, সুধু তা নয়—এ বিষয়ের আরো একটী বিশেষ কারণ ছিল, সেটী কিন্তু রামানন্দ ছাড়া আর কেহই জানিত না; অনেক চেষ্টাতেও প্রাণের বন্ধু ধীরেন্দ্র তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে কারণটা আর কিছুই নয়—কেবল, বিবাহের দিন কতক পর হইতে, আনন্দ কুটীরে আসা অবধি, প্রতিদিন মধ্যরাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া নিরুপমা চুপে চুপে ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইত। আবার সেইরূপ, অল্প সময়ের মধ্যে—কিছু কম বা ঠিক এক ঘণ্টার ভিতরে—চুপি চুপি ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন রামানন্দ ইহার বিন্দু বিসর্গও টের পান নাই। পরে ক্রমে যখন জানিতে

পারিলেন, প্রতি রাত্রে স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন; যখন ঘটনাটী শুধু স্বপ্নজাত নয় বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, তখন যে তাঁহার মনে সন্দেহের, অভিমানের সহিত ঈষৎ ক্রোধের উদয় হইল—বিচিত্র কি? প্রেম-দেবতাই যে অন্ধ, প্রেমের আর একটা নামই যে সন্দেহ! অভিধানে না বলিলেও, এটা খুব সঠিক সত্য, ইহা কে না জানেন? কিন্তু তিনি এত ধীমান যে, নিজ পত্নীকে এ সম্বন্ধে কোনো 'কথা জিজ্ঞাসা করা; শয্যা হইতে নিরুপমার উঠার সময়ে নিজে জাগরিত থাকিলেও, হাসিয়া কি কাশিয়া কিম্বা অন্য কোনো রকমে সেটা জানানো; গোপনে গোপনে নিরুপমার সঙ্গে যাওয়া; অথবা তাঁহার প্রিয়সহচরী অমলা বিমলাকে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। অসময়ে সকল দিক্ নষ্ট হইবার ভয়ে তখনো, বিনা কারণে, মনে অবিশ্বাসকে সঠিক স্থানদান করেন নাই। চতুর রামানন্দ জানিতেন—একবার মনের মধ্যে অবিশ্বাসকে স্থান দান করিলে তাহাকে দূর করা সহজ হইবে না; নিজের এবং নিরুপমার চিরজীবন এককালে নষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য, বিশেষ তদারক ও অনুসন্ধান করিয়া সকল কথা জানা এবং অবস্থাবোধে ব্যবস্থা করা ভাল। এমন সব পারিবারিক কাজে হঠকারিতা একেবারে পরিত্যজ্য।

কিন্তু ভবিতব্যতার হাত এড়ান লোকের পক্ষে সহজ নয়। যাহার ভাগ্যে যখন যেটা ঘটিবার ঘটিবেই। কাহার্ সাধ্য তাহার

নিবারণ করে? অদৃষ্টবাদীরা সকল কাজেই নিজ নিজ অদৃষ্টের (কিস্‌মতের) উপর নির্ভর করেন। এ জীবনে যাহা কিছু হয়, নিজের বুদ্ধির, নিজের বিদ্যার, নিজের মতামতের কিম্বা নিজের স্বভাবের দ্বারা যে সে সকল ঘটে, তাঁহারা সেটা মানেন না। তাঁহাদের মতে সহস্র চেষ্টাতেও, অনুষ্ঠিত কোনো কাজ নিবারিত হইবার নয়; সুতরাং তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী; মানুষের চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না বলিয়া তাঁরা ভাগ্যকে "অদৃষ্ট" বলেন। কেহ কেহ দৈব এবং পুরুষকার মানেন। অর্থাৎ বলেন যে, ভাগ্যে লেখা থাকুক আর নাই থাকুক, দৈব কর্ত্তৃক সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত ও অনুষ্ঠিত হয়; পুরুষকে উদ্যোগী হইয়া সে সকল ফলে পরিণত করাইতে হয়। অপর পক্ষে, কোনো কোনো মহাজন এ দুইটার কিছুই মানেন না। ইঁহাদের মতে, এ জগতে যে কিছু ঘটনা হয় সমস্তই স্বভাবের গুণে —বিধাতার অকাট্য অনিবার্য্য নিয়মে বা প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে! কেহ কোনো চেষ্টা করুক আর নাই করুক, প্রকৃতির কার্য্য হইবেই হইবে! আবার, কেহ সহস্র চেষ্টা করিলেও, যে কাজটা না ফলিবার, সেটা কখনো ফলিবে না। এই গ্রন্থে বর্ণিত সময়ে এ সকলের কোন্ কোন্ মত দেশে খুব প্রচলিত ছিল, রামানন্দ বাবু এ সকলের কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন, সেটা কোনো ইতিহাসেই লিখে না, সুতরাং, কে বলিবে? তিনি যে মত অবলম্বন করুন না কেন, আমাদের কিন্তু সে বিষয়ে কোনো কথা বলিবার অধিকার নাই।

আমরা গল্প-লেখক; যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন গল্পের ঘটনা-স্রোতে যে দিকে পারিব, ভাসিয়া যাইব। সুতরাং রামানন্দ-নিরুপমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই মাত্র বিবৃত করিব। ফলের সহিতই আমাদের সংস্রব, কারণের সঙ্গে কিছুমাত্র নাই। এজন্য, এ সকল মীমাংসার ভার সুধু দার্শনিক এবং তার্কিক পণ্ডিতগণের উপর থাকিল।

* * * * * * * *

ফাল্গুন মাস। মধুর জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী-যামিনী। শীতের অপগমে প্রকৃতি অপূর্ব্ব মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষগণ পুরাতন বেশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন রাঙা রাঙা কচিকচি পাতায় আপাদ-মস্তক সুশোভিত হইয়াছে। রামানন্দ বাবুর সখের পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় সুগন্ধ ও সুবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চক্ষুর এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত বাসনাকে কতক পূর্ণ করিতেছে। তাদের সুবাস "আনন্দ-কুটীর" অবধি ছুটিয়াছে; ছুটিয়া, সমাগত নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্ব স্বজনগণকে প্রফুল্লিত করিয়া তুলিয়াছে। দিনের বেলা যে সমস্ত অলিকুল পুষ্পে পুষ্পে উপবেশন করিয়া তাহাদের সঞ্চিত গুপ্তমধু হরণে বিশেষ ব্যস্ত ছিল, নিশাগমে তাহারা এক্ষণে নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাগত। সুতরাং তাহাদের গুণ্ গুণ্ ধ্বনিও এককালে নিস্তব্ধ। আজ্ আনন্দ-কুটীরে মহাসমারোহ। আজ্ রামানন্দ-নিরুপমার বিবাহের তৃতীয় বৎসর পূর্ণ হইল,

তাহারই "জন্মদিন," "সালগিরা" বা "বাৎসরিক" বলিয়া উৎসাহের, আনন্দের, ধূমধামের সীমা পরিসীমা নাই। "আনন্দ-কুটীর" নাম যেন প্রকৃত পক্ষে আ'জ্ সার্থক দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত দিন নৃত্যগীত, পানভোজন, শয়ন উপবেশন, ভ্রমণ দর্শন, শ্রবণ কথোপকথন, আমোদ আহ্লাদ—অবারিত দ্বার, অগণ্য লোক-সমাগম—মেয়ে পুরুষে, বালক বালিকায়, দাস দাসীতে, গাড়ী ঘোড়া পাল্‌কী তাঞ্জাম চৌপায়ায় অত বড় বাড়ীতে যেন তিলমাত্র স্থান নাই! বিড়াল, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি বৃহৎ জন্তু দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র মক্ষিকাটীও ইতস্ততঃ-নিক্ষিপ্ত, ভুক্তাবশিষ্ট, মনোরম, সুস্বাদু খাদ্যাদির অংশ, নিশ্চিন্তভাবে মনের সুখে ভোগ করিতে পারিতেছে না। "দীয়তাং ভুজ্যতাং" বাক্য সার্থক করিয়া, সমস্ত দিন নানারূপ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া, নিশামুখে নিকটস্থ আত্মীয় কুটুম্বনিচয়কে আপন আপন আবাসে পাঠাইয়া, পরিজনবর্গ কতক নিশ্চিন্ত হইলে বাটীঘর যেন একটু সুস্থির হইল। সেবারকার মতন বার্ষিক ক্রিয়া সুসমাধা হইয়া গেল।

রজনী গভীর। বাহিরে জন-কোলাহল প্রায় কমিয়া গিয়াছে, অথচ একেবারে নিস্তব্ধ হয় নাই। ক্বচিৎ, মদ্যোন্মত্ত, অসম পদক্ষেপ-কারী, অসম্বদ্ধ-প্রলাপী লম্পটের অস্পষ্ট গীতি; চৌরকর্ম্ম-নিরত দুষ্টগণের পরস্পর সঙ্কেত-ধ্বনি; ভোজনাবশিষ্ট খাদ্য লইয়া শৃগাল কুক্কুরাদি হিংস্র জন্তুগণের বহির্দ্দেশে বিবাদ; অথবা বাদুড়, পেচক

প্রভৃতি নিশাচর পক্ষীগণের পক্ষরব শুনা যাইতেছে। রামানন্দ বাবুর অতবড় বৃহৎ অট্টালিকা এককালে নিস্তব্ধ—যেন জন-মানবশূন্য—বুঝি কোথাও একটী সূচি-পতন হইলে সে শব্দ শোনা যায়। অবিশ্রান্ত শ্রম-কাতর দাসদাসীরা সকলেই নিদ্রা-সুখে মগ্ন; পোষা পশু পাখীরা একটীও কেহ জাগিয়া নাই। কেবল, প্রহরিতায় নিযুক্ত বন্দুকধারিগণের সতর্কতাসূচক উচ্চ কণ্ঠধ্বনি মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতেছে।

কিন্তু ও কি? এমন জন-মানব-পরিশূন্য নিস্তব্ধ নিশীথে সাবধান-ন্যস্ত ওই পদ-শব্দ কাহার্? এত পরিশ্রমের পরও কি এ লোকের শরীরে শ্রান্তি, চক্ষুতে নিদ্রা, গমনে অলসতা নাই? আপাদ-মস্তক একখানা সাদা মোটা চাদরে মুড়িয়া, বামহস্তের দীপ-বর্ত্তিকা সাবধানে দক্ষিণ হস্তে রক্ষা করিয়া, চৌরের মতন ইতস্ততঃ সভয়ে দেখিতে দেখিতে, কে অত চুপে চুপে কোথায় যাইতেছে? ক্রমে, অন্দর প্রাঙ্গণ পার হইয়া, মধ্যদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, ঐ যে বহির্ব্বাটীর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল; গায়ের চাদর সরাইয়া আশে পাশে দুএকবার সাবধানে দেখিল; দেখিয়া, হস্তস্থিত চাবির সাহায্যে বৃহৎ একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল? এ যে রমণী-মূর্ত্তি দেখিতেছি! আবার যে-সে রমণী নয়, এ যে নিরুপমা! নিরুপমা এত রাত্রে চুপেচুপে বহির্ব্বাটীতে কাহার্ নিকট কি করিতে যায়,, পাঠক পাঠিকারা আসুন, আর অনুমানে আবশ্যক কি, স্বচক্ষে দেখা যাউক।

আপনাকে নিতান্ত একাকিনী ভাবিয়া নিরুপমা যে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে চুপেচুপে যাইতেছিলেন, সেটা তাঁর বিষম ভ্রম মাত্র। অন্য রাত্রে যাহাই হউক, আ'জ্ যে সেই নির্জ্জন পুরীতে তিনি একাকিনী ছিলেন না, এটা খুব ধ্রুব সত্য। যদি তাঁর মনে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ হইত এবং পশ্চাৎ-দিকে ফিরিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে সে রাত্রে যে তাঁর স্বামী নিজের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তাহার সঙ্গ লইয়াছিলেন, সেটা তিনি অনায়াসে জানিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া স্বধু একমাত্র আলোর উপর লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এক-মনে সাবধানে যাইতেছিলেন; সুতরাং কিছুই জানিতে পারেন নাই। দুই বৎসরাধিক কাল নিরুপমা এইরূপে প্রতিরাত্রে উঠিয়া যাতায়াত করিতেছেন, একদিনও কেহ কোনোরূপে জানিতে পারে নাই, সন্দেহ করে নাই, পশ্চাতে আসে নাই। আর সে দিনে—বিবাহের তৃতীয় বৎসরের পূর্ণ দিনে—অত শ্রান্তি ক্লান্তির পর, স্বামী যে হঠাৎ এমন করিবেন, এ কথা নিরুপমা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সমস্ত দিনের উৎকট পরিশ্রমের পর শয্যায় শয়নমাত্র রামানন্দ বাবু অঘোরে নিদ্রা গেলেন; প্রকৃত নিদ্রিতের মতন তাঁর নাসাগর্জ্জন হইতে লাগিল; ঠিক নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। নিরুপমা তবুও সন্দেহ দূর অভিপ্রায়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জাগ্রত রহিলেন। পরে, স্বামী নিদ্রিত হইয়াছেন ভাবিয়া, হাতে নিশ্বাস-বায়ু-পতন পরীক্ষা করিয়া তবে নিঃশব্দ-পাদক্ষেপে গৃহদ্বার খুলিয়া

চলিয়া আসিলেন। রামানন্দ বাবু যে কপট-নিদ্রিত ছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। হয়তো সে রাত্রে উঠিতেন না; অথবা অবস্থা বোধে শেষ রাত্রে উঠিয়া অভীপ্সিত দৈনন্দিন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। কারণ, ঐরূপে অধিক রাত্রে যাওয়া আসা তাঁহার একটা নিত্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এদিকে, পত্নীর হস্তস্থিত বাতির আলোর সাহায্যে পথ-নির্দ্ধারণ করিয়া রামানন্দ তাঁহার অনেক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। উপরে উঠিয়া নিরুপমা হঠাৎ যে বৃহৎ ঘরের দ্বার, বস্ত্র-মধ্যস্থ একটা ক্ষুদ্র চাবির সাহায্যে খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন সেটী তাঁহাদের পৈতৃক আলেখ্য-গৃহ। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ হইতে রামানন্দ রায় পর্য্যন্ত রায়-বংশের যত নরনারী আনন্দ-কুটীরে বাস বা এ পর্য্যন্ত তথায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একখানি মানবাকার-প্রমাণ আলেখ্য-তৈল-চিত্র সেই ঘরের প্রাচীর সুশোভিত করিত। তা ছাড়া নানারূপ ঝাড় লণ্ঠন, বসিবার আসন, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা রাজড়া বা প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বিবিধপ্রকার চিত্র এবং নানা-দেশীয় সুদৃশ্য মনোমুগ্ধকর শিল্পদ্রব্য সমূহে গৃহটী সুসজ্জিত। ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিরুপমা যখন সম্মুখ-দ্বার বন্ধ করিলেন, তখন এত রাত্রে আলেখ্য-গৃহে তিনি কি করেন, আর কেহ সে ঘরে আবদ্ধ

অবস্থায় লুক্কায়িত আছেন কিনা, দেখিবার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া রামানন্দ বাবু প্রথমে একটু বিষণ্ণ হইলেন। পরে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল যে, পার্শ্বস্থ অন্য ঘরের মধ্য-দ্বার দিয়া নিজে অদৃশ্য থাকিয়া, স্ত্রীর কার্য্য-কলাপ সুন্দররূপ দেখিতে পাইবেন। সে মধ্য-দ্বারটী অন্য সকলের অজ্ঞাত, বাটীর কর্ত্তা বলিয়া কেবল তাঁহারই জানা ছিল। কাহারো জানিবার ভয়ে একটী স্থূল বহুমূল্য পর্দ্দার আড়ালে এমনভাবে উহা অবস্থিত: ছিল যে, যাহারা ঐ দ্বার নির্ম্মাণের, অবস্থিতির বা উন্মোচনের কৌশল বা উপায় না জানিত, তাহারা উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনো কোনো সন্দেহ পর্য্যন্ত করিত না। এতদিন এ বাটীতে বসবাস করিয়াও নিরুপমা একথা ঘুণাক্ষরে জানিতেন না। সুতরাং আপনাকে সম্পূর্ণ একাকিনী ও নিরাপদ জানিয়া নির্ভয়ে নিত্যানুষ্ঠিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একবার—কেবল একটীবার—যেন কোনো সামান্য শব্দ শ্রবণে চকিতা হরিণীর মত ভীত নয়নে চতুর্দ্দিক্; নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বহুদিনের অনুন্মোচিত দ্বার রামানন্দ কর্ত্তৃক সন্তর্পণে খোলা সময়ে ক্যাঁচ্ করিয়া হয়তো একটু সামান্য শব্দ হইয়াছিল; অথবা সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট রেসমী পর্দ্দা হয়তো বাতাসে একটু দোদুল্যমান হইয়াছিল; কিম্বা স্বভাব-ভীতা নিরুপমা নিজের ছায়া নিজেই দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কে সঠিক বলিবে?

উৎসুক ব্যস্ত রামানন্দ বাবু দেখিলেন, একটু ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া একখানি সুবৃহৎ, সকলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নূতন, চিত্রের সম্মুখে নিরুপমা আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিবাহ-কার্য্য শেষ হইবার পর যে সমুদয় অমূল্য অতুল্য দুষ্প্রাপ্য সুন্দর বসনভূষণ পরিধান করিয়া নিরুপমা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মুখে ভূতল-ন্যস্ত-দৃষ্টি হইয়া প্রফুল্লমুখে সলজ্জ-নম্রভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন; সলজ্জনম্রভাবে, অথচ যে ভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহার রূপের মাধুরী যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া দেহ-কান্তিকে চতুর্গুণ বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল; সভাস্থ বিজ্ঞ অবিজ্ঞ, বয়ঃস্থ যুবক, বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকলকেই যে অতুল রূপরাশি দেখিয়া একবাক্যে রামানন্দের নির্ব্বাচন-শক্তির শত শত প্রশংসা করিতে হইয়াছিল; কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চিত্রকর পীতাম্বরের অপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক সেই নিজ-প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া নিরুপমা চিত্রলিখিত পুত্তলীবৎ কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া, হস্তস্থিত বৰ্ত্তিকাটী উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন—যেন কোনো অপরিচিতের মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিতেছেন! সেই গভীর নিশীথে, জনসঞ্চার-রহিত নির্জ্জন গৃহে একাকিনী দাঁড়াইয়া—ঠিক যেন নিজের রূপে নিজে মুগ্ধা—পত্নীকে দেখিয়া, বিস্মিত স্তম্ভিত রামানন্দ ভাবিতে লাগিলেন—কোন্ চিত্রটী অধিকতর সুন্দর? অর্থাৎ, নিরুপমার স্বাভাবিক অনিন্দ্য-সুন্দর কমনীয় কান্তি; না, চিত্রকরের অদ্ভুত অঙ্কন-কৌশল! কিন্তু এই

ভ্রান্তি-চিন্তার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে যেন অন্তস্তল-ভেদী, মর্ম্মবিদারক একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবং বুঝি "মাগো" বা এবম্বিধ অস্ফুট কাতর-ধ্বনি একবার শুনিতে পাইলেন। অমনি মোহ অপগত হইল। রামানন্দ রায় পূর্ব্বের মত একাগ্রচিত্তে নিরুপমার পরবর্ত্তী কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন—প্রতিমূর্ত্তি-দর্শন-কার্য্য শেষ হইলে নিরুপমা ঘরের প্রাচীরের গায়ে হাত বুলাইয়া প্রাচীর-সংলগ্ন একটী অদৃশ্য ক্ষুদ্র-দ্বার উন্মোচিত করিলেন। রামানন্দ বিস্মিতের উপর আরো বিস্মিত হইলেন! তাঁহার জানা ছিল, জীবিত মনুষ্য মধ্যে তিনি নিজে এবং বন্ধু ধীরেন্দ্র ছাড়া আর কেহ ঐ দ্বারের অস্তিত্ব—কথা জানে না। এজন্য, তাঁহার স্ত্রী কিরূপে ঐ দ্বারের আবিষ্কার করিলেন, কিছুতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বুঝিবার অধিক সময়ও পাইলেন না। কেননা, দেখিলেন, ঐ দ্বার মধ্যস্থিত আলমারির ভিতর হইতে সুন্দর রেসমী-বস্ত্রাবৃত একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী বাহির করিয়া নিরুপমা তাহার বন্ধনী খুলিয়া ফেলিলেন। পরে আপন পরিহিত বহুমূল্য বসনভূষণ একে একে শীঘ্র-হস্তে উন্মোচন করিয়া আগুল্‌ফ-লম্বিত সুন্দর কেশপাশ অবেণীসম্বদ্ধ করিলেন। এবং শতগ্রন্থি-বিশিষ্ট এক ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া হস্তে একটী একতারা যন্ত্র লইয়া মৃদু মধুর রবে একটী প্রতিমূর্ত্তির নিকট হইতে অপরটীর নিকট গিয়া গিয়া যেন হাত পাতিয়া কি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামানন্দ প্রথমে এই সমস্ত কাণ্ডের স্বরূপ-মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন নাই। পরে বিশেষরূপ দেখিয়া হঠাৎ সে বেশভূষা চিনিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, যে একতারা বাজাইয়া আর ছিন্ন বেশভূষা পরিধান করিয়া, তখনকার "মলিনা" গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, যে বেশ দর্শনে হঠাৎ নীচবংশোদ্ভবা বলিয়া তাহাকে প্রতীয়মান হইলেও জ্বলদগ্নি মধ্যে পতনোন্মুখ শলভবৎ তিনি তাহার অতুলনীয় রূপ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন; সুপরিচিত অথচ আদরের সেই ভিখারিণী-বেশ—যেন যথার্থই বালিকাকালের মলিনা নামের অর্থ প্রতিপাদন জন্য, নিরুপমা আজিও ভুলিতে পারেন নাই। জানিলেন, বুঝিলেন, যে অগণ্য দাস দাসী, মনোহর অট্টালিকা, দুষ্প্রাপ্য অলঙ্কার, জগদ্দুর্লভ স্বামী-সোহাগ কিছুতেই তাঁহার পূর্ব্ব নীচভাব মন হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আরো বুঝিলেন—কাজে না হইলেও, মনে মনে, নিরুপমা যে ভিখারিণী এখনো সেই ভিখারিণী রহিয়াছেন। বুঝিলেন—এখন স্পষ্ট জানিলেন—কি অভিপ্রায়ে প্রতিদিন গভীর রাত্রে শয্যাতাগ করিয়া নিরুপমা অত চুপে চুপে যাওয়া আসা করিতেন—দুই তিন বৎসরের অজানিত গুহ্য-কথা এক রাত্রিতে সুস্পষ্ট জানা গেল! নিরুপমার অন্যাসক্তি নয়, পূর্ব্বের নিজাসক্তি এখনো পূর্ণরূপে তাঁহাতে বিদ্যমান! অভ্যাস বুঝি স্বভাবের কনিষ্ঠ ভাই! হা ধিক্!

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস—প্রেম পারণাগে।

অন্যান্য নানা বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে রামানন্দ রায় যদি রিপুবশ-অভ্যাস শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে এ জগতে বুঝি তিনি সর্ব্বসুখী হইতেন; বোধ হয়—অথবা বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—তাঁহার তুলনা অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইত! গ্রন্থকারকেও এরূপে নানা পারিবারিক পুঁথি ঘাঁটিয়া এ রকম ইতিহাস লিখিতে হইত না। কিন্তু অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃ-হীন হওয়াতে তিনি কতকটা আদরে লালিত, যত্নে বর্দ্ধিত এবং নিজ স্বাধীনতায় চালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে অনেক সময়ে অনেক রূপ বিষয়ে হঠাৎ অভিমানের উদয় হইত—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও কোনো কাজ করিতে দেখিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। এই ক্রোধ সকল সময়ে বাক্যে বা কার্য্যে না দেখাইয়া তিনি মনে মনে চাপিয়া রাখিতেন বটে, কিন্তু অন্য কোনো সময় সুযোগ পাইলে তাহার বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইতেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধীর-প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে ইহা উচিত নয়, সকলেই এ কথা মানিবেন। কিন্তু উচিত অনুচিত বিচার ভার আমাদের নয়। আমরা যাঁহার বিষয় যেরূপ জানিয়াছি, কেবল তাহাই দেখাইতেছি মাত্র এ কথা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

এরূপ চরিত্রবান পুরুষ নিজ পত্নীর কার্য্য কলাপ এত দীর্ঘকাল স্বচক্ষে দেখিয়াও কেন যে এত দিন তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার

চেষ্টা করেন নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। যেমন, আগ্নেয়-পর্ব্বতের অভ্যন্তরে অনেক দাহ্য-পদার্থ চির-বিদ্যমান থাকিলেও বহ্নিমান পর্ব্বত হইতে, বিশেষ কারণ ব্যতীত, যখন তখন সে সকল বহির্গত হয় না; অথচ যখন বাহির হয় তখন তাহাদের তেজে, নিকটে যাহা কিছু থাকে সমস্ত দগ্ধ, বিদলিত বা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। নিরুপমার অনুষ্ঠিত আপাত-বিসদৃশ কার্য্য দর্শনে রামানন্দের ঠিক সেইরূপ হইল। সেরূপ স্থলে সেরূপ ক্রোধের বিকাশ জানান উচিত কিনা তাহা বিচার করার ক্ষমতা তাঁহার একেবারেই রহিল না। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি-মূর্ত্তির নিকট নিরুপমার ভিক্ষা-প্রার্থনা-কার্য্য শেষ হইতে না হইতে রামানন্দ রেসমী পরদা সরাইয়া হঠাৎ প্রকাশিত হইলেন এবং জলদ-গম্ভীর-নাদে ক্রোধ-বিকম্পিত-স্বরে কহিলেন "বেশ নিরুপমে, বেশ! রায়ভবনের কর্ত্রী, অতুল ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, রাজরাণীর পক্ষে এ উত্তম কাজ বটে! তুমি যে বংশে উৎপন্না হও, তিন বৎসর আগে কাজে যেমন ছিলে, এখনো মনে মনে যে তেমনি ভিখারিণী আছ, কেহ না বলিয়া দিলেও, গোপনে অনুষ্ঠিত তোমার এই নিত্য-ভিক্ষা-প্রার্থনা-কাজে এটা এবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে। এখন বুঝিলাম, কেন নিত্য-রাত্রে উঠিয়া তুমি—"

যদি সে ঘোর দ্বিপ্রহর-রাত্রে সেই নির্জ্জন গৃহে তথা-অবস্থিত দম্পতিকে—একজন ক্ষোভে রোষে অভিমানে জ্ঞান-শূন্য, অন্যা

বিস্ময়ে, ভয়ে, চিন্তায় বিহ্বলা—কেহ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত বলিতে পারি না। চিত্রকর পীতাম্বরের পক্ষে এই দৃশ্য যে সুন্দর আঁকিবার চিত্র হইত, তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। ঘোর নিশীথ কালে গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তি হঠাৎ বজ্রপতন শব্দে যেরূপ চমকিয়া উঠে, স্বামীর মুখে নিজের অনুষ্ঠিত কাজের কথা শুনিয়া নিরুপমা তেমনি হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন। নিমেষ মধ্যে বুঝিয়া লইলেন যে, তিনি যে মনে ভাবিতেন তাঁহার রাত্রের যাতায়াত-কথা স্বামী বা অপর কেহ জানেন না, সেটা নিতান্ত ভ্রম। শ্যেন-ভীতা কপোতী, ব্যাধ-পীড়িতা মৃগী, ব্যাঘ্র-তাড়িতা গাভী যেমন কম্পিত-দেহে চকিত-নয়নে এদিক্ ওদিক্ দেখে; কোনো আশ্রয় না পাইয়া সম্মুখে অকূল পাথার ভাবিয়া বিষম ভয়ে আকুল হয়। অসময়ে হঠাৎ সে গৃহে স্বামীর আবির্ভাবে তথা ক্রোধ-দর্শনে এবং শ্লেষবাক্য-শ্রবণে নিরুপমা সেইরূপ হইলেন। কিন্তু একটীও কথা কহিতে, এমন কি, ক্রুদ্ধ স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেও সমর্থ হইলেন না। অধোদৃষ্টি হইয়া মেঝের উপর পদনখ দ্বারা যেন কিছু খুঁড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। তাঁহাকে দোষ-ক্ষালনে সচেষ্টিতা না দেখিয়া রামানন্দ বাবু পূর্ব্বাপেক্ষা আরো রাগত হইলেন এবং কঠোর কর্কশ-বচনে কহিলেন, "উজ্জ্বল বস্তু হইলেই যে সোণা হয় না, পিত্তলও হইতে পারে;

সুদৃশ্য লাল ফলও যে মাখাল ফল হয়, তোমাকে আর তোমার কার্য্য কলাপ দেখিয়া আ'জ্ আমার ইহাই দৃঢ় প্রতীতি হইল। আমি অনেক সহিয়াছি, ঢের বুঝিয়াছি, বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের নিজের স্বভাবের যতটা সহনীয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আর নয়। আ'জ্ এ সকলের চরম—আ'জ্ তোমার প্রণয়-পরীক্ষার চূড়ান্ত—আমারও মোহ-নিদ্রা ভঙ্গের শেষ হইল! নিজের পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম, জানিয়া শিখিলাম যে, শ্রেষ্ঠ উচ্চবংশের রক্তের সঙ্গে নীচ দরিদ্র বংশের রক্ত মিশ্রণ কখনো সম্ভব নয়! বুঝিলাম, এইজন্যই বহুদর্শী পণ্ডিত-জনেরা অনেক গবেষণা—অশেষ পর্য্যবেক্ষণ—দ্বারা সমান সমান ঘরে যৌন-সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যখন এতদিনের এতদূর চেষ্টায় হইল না, তখন তোমার আমার মনের মিল, হৃদয়ের একতা, প্রণয়ের অচ্ছেদ্যতা আর এ জন্মে ঘটিবে না। মনে মনে তুমি এখনো সেই ভিখারিণী আছ, আর—আমার নিজের বলা শোভা পায় না—উচ্চ সম্ভ্রান্ত ধনী রায়বংশের একমাত্র বংশধর—আমার পরিণীতা ভার্য্যা হইয়া তুমি যে এরূপ করিবে, ইহা সত্যের দূরে থাক, স্বপ্নেরও অগোচর। অতএব তোমার আমার ছাড়াছাড়িই ভাল। তোমার আমার এই শেষ দেখা শুনা। আমি আর এজন্মে তোমার মুখ দেখিব না, নিজমুখও আর তোমায় দেখাইব না, ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প জানিবে——"

নিরুপমা আর বেশী শুনিতে পারিলেন না। স্বামীর তিরস্কারের উত্তরে, যেন কিছু বলিতে যাইতেছিলেন; মুখ তুলিয়া দেখেন, পর্দ্দা সরাইয়া চলিয়া যাইবার জন্য স্বামী পদ বাড়াইয়াছেন। তিনি কিছু বলিতে না বলিতে নির্দ্দয়-হৃদয় রামানন্দ দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। সব ভুলিয়া—অমানুষিক বলপ্রয়োগ করিয়া—নিরুপমা যেন তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, যেন পুনরায় কি বলিতে চেষ্টা করিলেন; না পারিয়া—অস্ফুট অথচ হৃদয়-বিদারক, মর্ম্মভেদী এক চীৎকারধ্বনি করিয়া কুঠার-ভিন্ন-বৃক্ষচ্যুতা লতিকার মত সেইখানে ভূতলে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া গেলেন।

* * * * * *

নিরুপমা যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন রজনী প্রায়-অবসন্ন হইয়াছে। শেষরাত্রির মৃদুমধুর বাসন্তী-পবনের সংস্পর্শোৎফুল্ল আনন্দ-কুটীরের চতুর্দ্দিকস্থ বারান্দায় পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিল, পাপিয়া, দ'য়েল, ময়না, শ্যামা প্রভৃতি গৃহপালিত মিষ্টকণ্ঠ সুগায়ক পক্ষীকুল মধুরস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তৎকর্ত্তৃক আনীত দীপ-বর্ত্তিকা নির্ব্বাণোন্মুখ-প্রায় জ্বলিতেছে। সেই রাত্রিশেষে, সেরূপ গৃহে, তথাবিধ অবস্থায় আপনাকে শায়িত দেখিয়া নিরুপমা প্রথমে সঠিক কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরে যখন নিজ-পরিহিত ছিন্নভিন্ন বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি পড়িল এবং অল্পে অল্পে

পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল, তখন সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ সহ কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ এরূপ করিতে সাহস হইল না। প্রাতঃকালে বাটীসুদ্ধ সকলেই এখনি জাগরিত হইয়া তাঁহার রাত্রির কার্য্যকলাপ জানিতে পারিবে এইরূপ ভয়ে রাত্রির পরিত্যক্ত নিত্য-ব্যবহার্য্য নিজ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দ্রুত পদক্ষেপে অথচ খুব সাবধানে অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন এবং আপন শয়নগৃহে উপবিষ্ট হইয়া নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন! তিনি সভয়ে বিস্ময়পূরিত নেত্রে দেখিলেন—দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহার স্বামী সে রাত্রে পুনরায় শয়ন-গৃহে প্রবেশ করেন নাই। পরদিন বেলা হইলে অমলার দ্বারা কারণ অনুসন্ধান করাইয়া জানিতে পারিলেন যে, মধ্যরাত্রে কোনো অজানিত কারণে, অশ্বশালায় গিয়া ঘোটকারোহণে স্বামী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি হইল, কিরূপে অতিকষ্টে তিনি দিন যামিনী কাটাইতে লাগিলেন, সহচরীদের হাস্য-পরিহাসের উত্তরে কি কি বলিলেন, তাহা বর্ণনাপেক্ষা ভাবুকজনেরই অনুমেয়; গ্রন্থকারের বর্ণনীয় বিষয় নয়। পুরীসুদ্ধ সকলেই রামানন্দের হঠাৎ বিদেশ-গমনে বিশেষ বিস্মিত হইল। এরূপ আকস্মিক-গমন ঠিক-নূতন না হইলেও "বিশেষ জরুরি কাজে সহরে গিয়াছেন" ধীরেন্দ্র যে এইরূপ কথা রাষ্ট্র করিলেন, তাহা কেহ বড় একটা বিশ্বাস করিলেন না লেখা বাহুল্য মাত্র।

সপ্তম উচ্ছ্বাস—অবস্থা-বিপর্য্যয়ে।

দুই মাস গত হইয়াছে, তৃতীয় মাসও যায় যায়। বৈশাখ মাস। নূতন বৎসরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে অনেক নূতন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু নিরুপমার নিজ সম্বন্ধে নূতন উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বরং কৃশ শরীর, মলিন মুখ, হীন বেশ, শরীরে অযত্ন, আহারে অনিচ্ছা, স্বল্প বাক্যালাপ প্রভৃতি নানা লক্ষণ অবনতির পরিচয়ই দিতেছিল। অমলা বা বিমলা কেশ বাঁধিতে গেলে নিরুপমা বিস্তর অনুরোধের পর, হয় অন্যমনস্কভাবে বাঁধিতে বসেন; না হয়, খানিক বাঁধা হইলেই তাহাদের হস্ত হইতে দীর্ঘ বেণী ছিনাইয়া লইয়া কোথায় উঠিয়া যান; কোনো কোনো দিন হয়তো বা বাঁধিবার সাবকাশ হয় না। আহারে নিত্য এক আধবার বসেন মাত্র। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে "ভালরূপ ক্ষুধা নাই" অথবা "আ'জ্ কা'ল্ ভাল হজম হয় না" এই রকম ওজর আপত্তি করেন। একবস্ত্র হয়তো দিনান্তে পরিবর্ত্তন করেন, কখনো বা বদল করিতে স্মরণ হয় না। পোষা পাখীগুলির অনেকে আহারাভাবে শীর্ণ, যত্নাভাবে জীর্ণ, স্নান না করান জন্য রূক্ষ। কোনোটা মৃত, দুটা চারিটা বা সুযোগ পাইয়া উড়িয়া পলাইয়াছে। বানর, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুগণের অবস্থাও প্রায় ঐরূপ। মালিরা কোনো দিন ফুলগাছে জলসেচন করে, অধিক দিন দেয় না; সে সব মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষের কোনো কোনোটা জলাভাবে

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে মরিয়া গিয়াছে, দু পাঁচটা মরমর ; এটা ফুল ফুটিবার ঠিক সময় হইলেও অন্যান্য বারের মতন এবার বাগানে সে রকম শোভা বা সুগন্ধ নাই। কৃত্রিম সরোবরের বিচিত্রবর্ণ মৎস্যগুলা নিয়ম-মত সুচারু আহার পায় না ; সরোবর সকল সময় জলে পূর্ণ থাকে না বলিয়া কাক, চিল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীরা তাহাদের অধিকাংশকে উদরস্থ করিয়াছে। সুযোগ পাইয়া রক্ষক এবং সেবকগণ নিজ নিজ কাজ কর্ম্মে অমনোযোগী ; দুচার জন বাটী হইতে সময়ে কাজে আসে না ; অথচ এ সকল অনিয়মের তদারক করার লোক নাই। অন্দরের সামিল বলিয়া দেওয়ান বা তদধীনস্থ কেহ বরাবরই এদিকে তদারক করিতেন না। সায়ংকালে বা অন্য সময়ে যেই মাত্র একাকিনী থাকেন, অমনি গালে হাত দিয়া নিরুপমা কত-কি-ছাই-ভস্ম ভাবিতে বসেন। প্রাতে শয্যা তুলিতে গিয়া অমলা বিমলা দেখে, যে, উপাধান অশ্রুজল-সিক্ত— বুঝি বা নিরুপমা সারা রাত্ রোদনে কাটাইয়াছেন। এই সকল লক্ষণ ঈক্ষণে স্পষ্ট কারণ জানিতে অক্ষম হইলেও অন্যেরা অনুমান করিয়াছে—স্বামী স্ত্রীতে কোনো বিশেষ কারণে বিষম মনান্তর ঘটিয়াছে। দাসী এবং পাচিকা মহলে নানারকম কল্পনা জল্পনা উপস্থিত হয়! উহার মধ্যে দার্শনিক ও কবি শ্রেণীরা নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোনো কিছু সঠিক মীমাংসা করিতে পারেন না। তাহাতে অনেকের বিষম কষ্ট, উত্তমরূপ আহার পরিপাক

বা নিশাভাগে সুনিদ্রালাভ তাঁদের অদৃষ্টে ঘটে না। এ সকলের কোনো প্রতীকার সম্ভবপর নয় দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই আবার যেন বিশেষ চিন্তিত।

রায়-বাটীর এই সকল আভ্যন্তরিক গোলযোগ সময়ে গ্রাম-বাসীরা যে নিশ্চিন্ত থাকিবে, এটা কখনো সম্ভব হইতে পারে না! স্নান ও গাত্রধৌত করা সময়ে, আহারান্তে আচমন-কালে, তাস-ক্রীড়া এবং গল্পকরার অবসরে, পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধাদের আর অন্য কথাবার্ত্তা নাই। যেন তাঁহাদের কোনো অতি-নিকট আত্মীয়ের বিষম বিপদ উপস্থিত—যেন রামানন্দ-নিরুপমার দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী তাঁদের মতন এ জগতে আর কেউ নাই। বিশেষতঃ, আনন্দপুর গ্রামের প্রধান বার্ত্তা-বাহিকা—স্ত্রী পুরুষের এরূপ বিচ্ছেদের প্রধান-পরামর্শ-দাত্রী শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী দেবী নিত্য অপরাহ্নে রায়-বাটী হইতে যে নূতন নূতন অকাট্য-যুক্তি-পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহাতে বিশ্বাস না করার কোনো কারণই ছিল না। যখন রামানন্দ রায়ের আকস্মিক ভবন-ত্যাগের সংবাদ গ্রামে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দেবী বাটীতে ছিলেন না। দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়-কন্যার ভ্রাতুষ্পৌত্রীর শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে লাড়ু প্রস্তুত তথা অন্যান্য নানা রকমে সাহায্য করিতে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে নগরে ফিরিয়া আসিয়াই নিজের আত্মীয়তা ও

সহানুভূতি দেখাইবার জন্য তিনি নিরুপমার সহিত অতি নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া সাদরে তাঁহার এই অকারণ-বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কোনো উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই, অব্যর্থ মন্ত্র-তন্ত্র-বলে রামানন্দকে বশীভূত করিয়া স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন সংঘটন করিয়া দিবেন এরূপ আশ্বাস-বাক্যে আপ্যায়িত করিতে ভুলিলেন না। কিন্তু তপোবন হইতে রাজা দুষ্মন্তের প্রস্থানের পর পতি-বিয়োগ-বিধুরা, বিষম চিন্তা-পরায়ণা শকুন্তলা যেমন করতল-লগ্ন-শীর্ষা থাকায় প্রচণ্ড কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসার ভিক্ষা-প্রার্থনা-বাক্য শুনিতে পান নাই; দেবীর নানারূপ আশ্বাস-প্রবোধ-বাক্য তথা অকাট্য যুক্তি পরম্পরা সেইমত নিরুপমার শ্রুতি-গোচর হইয়াও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইল না। কোনোমতে যদিও বা কতক হইয়া থাকে, হৃদয়গত যে হয় নাই সেটা খুব ধ্রুব সত্য। নচেৎ, এত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া দেবী নীচের পাচিকা ও দাসী মহলে হঠাৎ অবতরণ করিবেন কেন? অনাদরে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা ঋষি শকুন্তলাকে বিষম শাপ দিয়াছিলেন, যাহার ফলে রাজা দুষ্মন্ত বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে পরে চক্ষে দেখিয়াও চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখানে দেবী নায়িকাকে তেমন কোনোরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন কিনা সেটা কোনো গ্রন্থে লিখে না, সুতরাং আমরা সে কথা সুনিশ্চিত বলিয়া উঠিতে পারি না। তবে, তিনি যে প্রকাশ্যে কোনো শাপ গালাগালি প্রদান করেন নাই, মনে মনে হয়তো দিয়া

থাকিবেন, এটা অনেকেরই ধারণা। যাহা হউক, সেই অনাদরের দিন হইতে প্রতি দিন অবাধে নিয়মিত সময়ে দাসী ও পাচিকা মহলে দেবীর আবির্ভাব হইত এ সংবাদ আমরা খুব সঠিক পাইয়াছি। স্বতরাং, গ্রামস্থ শ্রীমতীরা নিত্যই রায়-বাটীর সংবাদ পাইতেন, তা কিছু নূতন থাকুক আর নাই থাকুক। এখানে এই একটী স্বরূপ কথা বলিয়া রাখা ভাল, যে, এই আন্দোলনের দলের মধ্যে কেবল মাত্র মুকুর্য্যেদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কেহ কোনো রকম যোগদান করেন নাই। দৈবাৎ তাঁহাদের কেহ এই সমস্ত আন্দোলন-স্থলে উপস্থিত থাকিলে কোনো কথায় কেহ কোনো রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা উত্তর প্রত্যুত্তর দান কিম্বা তর্ক বিতর্ক করিতেন না! ইহাতেও তাঁহাদের কিন্তু নিষ্কৃতি ছিল না। অত বয়স পর্য্যন্ত মাধুরী দেবী অনূঢ়াবস্থায় থাকায়—কুলীনের ঘরে তখনকার দিনে নূতন না হইলেও—একে পল্লীস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জনগণের আহার নিদ্রা রহিত-প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বতরাং এই স্বযোগে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা রসালাপের কথা বিশেষ-ভাবে জল্পিত কল্পিত এবং পরিশেষে যে গ্রাম-ময় প্রচারিত হয় নাই এরূপ কখনো হইতেই পারে না? এ সকল কথা প্রথমে গ্রামস্থ স্ত্রী-মহলে রচিত হইয়া শাখা-পল্লব সহ বিবিধ আকারে পুরুষদের কর্ণগোচর হইত এবং বকুলতলায় খোস গল্পের আসরে,

পাশার আড্ডায়, তাসের আর দাবার সভায়, মন্ত্রী-সভার শেষ মীমাংসার মতন এক আধটা মতামত নির্দ্ধারিত হইয়া যাইত। বিশেষতঃ, রামানন্দ বাবু গ্রামে থাকিতে মাধুরী যে ঘন ঘন তাঁহাদের ভবনে যাতায়াত করিতেন, এখন একেবারেই যান না, ইহার কারণ নির্দ্দেশ ইঙ্গিতে যে হয় নাই, এ কথা বলিলে আনন্দ-পুরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

অষ্টম উচ্ছ্বাস—ভবন-পরিত্যাগে।

একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়—যে সময় পুরীসুদ্ধ সকলেই সন্তাপবারিণী নিদ্রাদেবীর সুখ-দায়ক ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে; যখন আর জাগিয়া থাকিতে না পারিয়া অমলা বিমলা সখীরা নিরুপমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার পার্শ্বের গৃহে শুইয়া পড়িয়াছে; যখন চন্দ্রদেব প্রথম প্রহরে নিজ বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করার পর সবে মাত্র অস্তাচল-গত হইয়াছেন—সেই অন্ধকার রাত্রে একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং একখানা সামান্য স্থূল গাত্রাবরণ গায়ে দিয়া নিরাভরণা নিরুপমা একাকিনী আনন্দ-কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। গমনের পূর্ব্বে কাহাকেও একটী কথা বলিয়া বা নিজের কোনোরূপ নিদর্শন রাখিয়া গেলেন না। কেবল পুরীর অধিষ্ঠাত্রী আনন্দময়ী দেবীর উদ্দেশে গৃহস্থিত তাঁহার সুন্দর চিত্রমূর্ত্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে গলদঞ্জলিকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা জগদম্বে, চলিলাম—দয়া ক'রে বিদায় দাও। বড় আশা ধরিয়া, মনে মনে কত সাধ আহ্লাদ পোষণ করিয়া, মনানন্দে যে আনন্দ-কুটীরে আসিয়া এতদিন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করিলাম, এবার জন্মের মতন সে ভবন ত্যাগ করিতে হইল। না করিয়া করি কি মা! আমার জন্য পতি নিজগৃহত্যাগী হইয়া চিরদিন বিদেশে বাস করিবেন জানিয়েছেন, এও কি মা, কথা? তিনি স্বাধীন-চেতা ইচ্ছাপরতন্ত্র পুরুষ মানুষ। অকারণে অনায়াসে স্বেচ্ছায় আমায়

পরিত্যাগ করিতে পারিলেন, করুন; স্পষ্ট শুনিতেছি—বিদেশে আবার বিবাহ করিয়াছেন, ভালই; কিন্তু তাঁদের এত বড় বৃহৎ পুরীর একপাশে আমি থাকিলে কি তাঁর সত্যসত্যই চলিত না? যে ভবনে শত শত দাস দাসী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় অনাত্মীয় কোনো-না-কোনো-রকমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, একটা প্রাণী আমি কি তার একধারে থাকিতে পারিতাম না? আর কিছু না হউক, বিনা-বেতনে পরিচারিকাভাবে তাঁর পদসেবা ক'র্ত্তুম, দিনান্তে তদীয় চাঁদমুখ দর্শনে নয়ন তৃপ্ত ক'র্ত্তুম, সে সুখে কেন বঞ্চিত্ হ'লুম, মা? আমি কে? কৃষ্ণনগরের রাজপথ থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া একজন সামান্য ভিখারিণী বৈ তো নয়। তা ভিখারিণী হই আর যা-ই হই, সত্য সত্যই কি এত নীচ বংশে জন্ম আমার, যে, সপত্নীর হিংসা অনিষ্ট, কি তার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ বচসা ক'র্ত্তুম? হায় মা, একবার যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে, এ অভাগিনী এই উদরে তাঁহারই ঔরস-জাত সন্তান ধারণ করিতেছে, তাহা হইলেও কি এমন নির্দ্দয়ভাবে দাসীকে ত্যাগ করিয়া চির-বিদায় দিতে পারিতেন? তুমি তো মা অন্তর্যামিনী, তুমি কি না জান? আমিতো তাঁহার চরণে ভ্রমেও কোনো অপরাধ করিনি; শ্রীচরণে স্থান পাবার নিতান্ত অযোগ্যা হ'য়েও যে তাঁকে পেয়েছিলুম, সেটা কেবল তোমারি দয়া অনুগ্রহে! কিন্তু পেয়েও তেমন যত্ন, তত ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে রকম মায়া মমতা করিনি; বুঝি

বয়স-সুলভ চাপল্যে পরম আরাধ্য স্বামী-ধনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রেছি; বুঝি আপনাকে অতুল ধনের ঈশ্বরী ভেবে মদ-গর্ব্বে তাঁকে খর্ব্ব ক'রেছিলুম। স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য-বস্তু, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র বল বুদ্ধি আশা ভরসা—স্বামী-ধনকে নিশ্চিতই অকারণে অবহেলা ক'রেছি! জ্ঞানতঃ না করি, নিশ্চয়ই অজ্ঞানতঃ ক'রে থাকবো! নৈলে মা, তুমি এমন নিদয়া হ'য়ে আ'জ্ আমাকে এমন ক'রে সকল সুখভোগ থেকে বঞ্চিত্ ক'র্ব্বে কেন? মা, শুনেছি অনুতাপই পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত; শত সহস্র দোষ ক'রেও মনে মনে অনুতাপের উদয় হ'লে দয়াময়ী তুমি নাকি সব মার্জ্জনা ক'রে থাক। তাই জিজ্ঞাসা করি, এখনো কি আমার প্রায়শ্চিত্তের বাকী আছে? এখনো কি চিন্তার—অনুশোচনার—তুষানলে মনের পাপরাশি ভস্মীভূত ক'র্ত্তে হবে? না হয় তাই হোক। কিন্তু আমার স্বামী যেখানে থাকুন তুমি তাঁকে দয়া ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে রেখো; দীর্ঘজীবী ক'রো; কখনো কোনো কাজে তিনি যেন তিলমাত্র কষ্ট না পান। এ অভাগিনী অকারণে যেমন কষ্ট পেলে, এ জগতে কেউ—এমন কি, আমার সপত্নীও—যেন শতাংশে এ রকম কষ্ট মনে বা কাজে কখনো না পায়। মাগো, তোমার শ্রীপাদপদ্ম যেন কখনো ভ্রমেও বিস্মৃত না হই।"

শাপভ্রষ্টা লক্ষ্মীরূপিনী নিরুপমা এইরূপে আনন্দ-কুটীর ত্যাগ করিলেন। হায় নিয়তি!

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম উচ্ছ্বাস—নব জীবনে।

ছয় সাত বৎসর অতীত। এই কয় বৎসরকাল নিজের অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী বিকাশ দ্বারা নিরুপমার শূন্যস্থান পূর্ণ অধিকার করিয়া মাধুরী একচ্ছত্রা রাণীর ন্যায় আনন্দ-কুটীরে রাজত্ব করিতেছেন। তাই কি যেমন তেমন রাজত্ব? অনেক সুন্দরী অনেক অন্দরে অনেকরূপ প্রতাপে গুরুলঘু ছোটবড় সকলের উপর রাজত্ব করেন; কিন্তু মাধুরীর মতন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে কাহারো পুর-শাসন করার কথা আমরা কোনো ইতিহাসে বা কাব্য-গ্রন্থে পড়িয়াছি, কৈ এমন মনে হয় না—এ প্রৌঢ় বয়সে চক্ষে দেখা তো দূরের কথা! বিধাতা যেন একাধারে সৌন্দর্য্য, গর্ব্ব, প্রতাপ, হিংসা, কর্কশতা, কৃপণতা, বাচালতা, নির্ল্লজতা প্রভৃতি মিশ্রিত গুণ দোষ দেখাইবার প্রয়াসেই এই অপূর্ব্ব রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ হেন নারীর তুলনায় তাঁর পূর্ব্ব-সৃষ্ট তিলোত্তমা কোথায় স্থান পাইবেন জানি না, অথচ এ কথা বলিলে কোনোরূপ অত্যুক্তি যে হয় না, ইহা খুব নিশ্চিত। রামানন্দ বাবু নিরুপমার জন্য কিছুকাল নানারকম কষ্টে যাপন করিয়াছেন; অনেক যত্নে, বিবিধ ঐকান্তিক চেষ্টাতেও

নিরুপমার মলিন স্বভাব নিজের মনের মতন ছাঁচে ঢালিতে পারেন নাই। নিরুপমার মনে নিজের পদগৌরব-জ্ঞান আদৌ ছিল না! অহঙ্কার দূরের কথা—বালিকার মতন সকলেরই সঙ্গে হাসি খুসি করিয়া তিনি বেড়াইতেন! কোনো অভুক্ত দরিদ্র লোক আসিয়াছে শুনিলে নিজের আহার ছাড়িয়া রূপার থালাসুদ্ধ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তাহাকে দিতেন। দাসী পাচিকার মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে, সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কাছ-ছাড়া হইতেন না, কাহারো নিষেধ শুনিতেন না। এ সকল ছাড়া, এত সব এমন কাজ করিতেন যে, সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও রামানন্দ রায়কে ঘাড় হেঁট করিতে হয়। তোমরা বল কি?—এ সকল কি উচ্চ রায়বংশের একমাত্র গৃহ-কর্ত্রীর কাজ? ছি ছি ছি!!

এখন কিন্তু তাঁহার এ সমস্ত অভাব শতগুণে পূর্ণ হইয়াছে! মাধুরীর মতন সর্ব্ব বিষয়ে গর্ব্বিতা, নিজ উচ্চ পদের গরিমায় পূর্ণ-হৃদয়া রমণী কখনো আনন্দ-কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন কি না, আনন্দপুর-নিবাসী অতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ রামসেবক ভক্তি-ভৃঙ্গ বহু চিন্তায় ও দীর্ঘ অনুসন্ধানে সেটা নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই! আর, শতাধিক-বর্ষ-বয়স্কা গোবরার মা হরিদাসী রামানন্দের পিতামহীকে ঘরে আসিতে দেখিয়াছে; তাঁহার আর তৎপুত্রবধূ রামানন্দের মাতার হাতের তেল নৈলে তার মাথার দীর্ঘ কেশ-রাশি ভিজিত না; তাঁদের পাতের প্রসাদ না পাইলে তার ক্ষুধার

নিবৃত্তি হইত না; এত দিনেও যাঁদের অসীম গুণরাশি সে একদিনের তরেও ভুলিতে পারে নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে কতবার বলিয়াছে; তাঁহারাও—সেই পূর্ব্বগতা কর্ত্রীরাও—আপনাদের পদ-প্রাধান্য দেখাইতে মাধুরীর কাছে নিশ্চিতই হারি মানিতেন, ইহা এই বৃদ্ধা এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, চন্দ্র সূর্য্য দেবতাগণকে সাক্ষ্য করিয়া, বলিতে প্রস্তুত ছিল, লোকে বলে, একথা খুব সত্য! কত দৃষ্টান্ত বা দিব? গল্পচ্ছলে দু একটা লিখিলাম মাত্র। আবার, কোনো দুর্ভাগা ভিক্ষুক-রমণী বা বালক এক মুষ্টি ভিক্ষা বা হাতের পাতের পরিত্যক্ত চাট্টিখানি অন্নকণা পাইবার প্রত্যাশায় আগেকার মতন যদি দৈব-গত্যা অন্তঃপুর-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হইত, সে দিন তাহার ভিক্ষুক-জীবনের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। অন্য কাজে অচলা গৃহিণী তখনই মুষ্টিবদ্ধ সম্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিতা হইয়া হতভাগার পলায়ন-ক্ষমতা পরীক্ষা করিতেন—ভিক্ষুকের সৌভাগ্য থাকিলে কোমল হস্তের প্রহার লাভ নিশ্চিত ঘটিত! সে প্রাতে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে চিন্তা বা স্মরণ করার সময়ও হইত না! না আসিলে নয় তাই অমলা বিমলা কাছে আসিতে পাইত! নচেৎ, তারা দুজন ছাড়া অন্য কোনো পরিচারিকা মাধুরীর ছায়া মাড়াইয়াছে এমন কথা বলিতে পারিত না; দৈবাৎ কোনো অপ্রতিবিধেয় কারণে তাহাদের কেহ ঘরে আসিলে তৎক্ষণাৎ ঘর ধৌত করিতে হইত। নচেৎ, গৃহিণী

নাসিকার কাপড় খুলিতেন না, তথারূপ দূষিত স্থান মাড়াইতেন না; বা, শত সহস্র মধুর গালি বর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না! পাকশালা বা ভাণ্ডার-গৃহ দেখা—তাতে চা'ল ডা'ল লবণ তৈল ঘৃত চিনি তরকারি প্রভৃতি সামান্য জিনিষ ছাড়া, সোণা রূপা হীরা জহরৎ বা এমন কি মূল্যবান সব জিনিষ আছে, যে, স্বয়ং গৃহকর্ত্রী নীচে নামিয়া সে সব দেখিতে আসিবেন, বলতো শুনি? বাবুর বিধবা মাসী ও বৃদ্ধা পিসি তবে আজীবন কি জন্য বাড়ীতে আছেন? ভাণ্ডারণী নামক পরিচারিকা কি জন্য বেতন খায় গা? তাহারা জিনিষ পত্র চুরি করে কিনা দেখিবার প্রয়োজন কি? সুযোগই বা কোথায়? গরিব ভদ্র ঘরের মেয়েরা কোনো রকমে কিছু পেলেই বা—এর জন্য এত ছোট-নজর হওয়া কি ভাল? আবার, যদি কেহ চুরিই করে, সে কি দেখাইয়া লইয়া যাইবে না কি রে? পান তৈয়ার প্রভৃতি নিত্য গৃহ-কাজ, দেব-সেবা, গো-সেবা প্রভৃতি সুচারুরূপে হইল কিনা দেখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক বন্দোবস্ত করা তো আছেই, যার যা কাজ, সে তো তা করিবেই। তার আবার তদারক কি? আর বাড়ীতে আছেই বা কয় জন? আগেকার আমলের যে সব নিকট বা দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া—কেহ বা বার্দ্ধক্য, কেহ বা আলস্য, কেহ কেহ বা দারিদ্র্যবশতঃ—আনন্দ-কুটীরে বাস করিত, নূতন কর্ত্রী মাধুরী শুভ আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অন্ন চিরকালের তরে

উঠিয়া গিয়াছে! এতকাল পরে, ভদ্র লোকের মেয়েরা কিরূপে কোথায় দাস্য-বৃত্তি বা ভিক্ষা করিয়া, কি পৈতার সূতা তুলিয়া খাইবেন, মাধুরী তার কি জানেন? মাধুরী কি তাঁদের পৈতৃক বা শ্বশুর বাড়ীর কিম্বা মাতুলালয়ের নায়েব-গিন্নি, যে, এ সকল কথার নিকাশ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য? তাঁরা যে এত দিন খেয়ে পোরে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়েছেন, এই-ই তাঁদের মাতৃ-পিতৃ-পুণ্য নয় কি? সুদ সুদ্ধ এ সকল আদায়ের যে বিন্দুমাত্র উপায় নাই, হায়, হায়, এইটাই কি কম দুঃখের বিষয়! তবে এঁদের পরিবর্ত্তে নিজের নিকট আর দূর সম্পর্কীয় যে সকল স্ত্রী পুরুষকে মাধুরী সাদরে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে না দেখিলে এবং যত্ন না করিলে ভাল হয় না। যাঁহারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি পাঠাইয়া আসিতে অপারক, তাঁহাদের মাসিক, যান্মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু না পাঠাইলে চলে না বলিয়াই যাহা কিছু করা। এ সমুদয় যে কর্ত্তব্য কাজ, না করিলে বিষম প্রত্যবায় আছে, এটা কয় জন বুঝে বল তো শুনি? ইহাতে কেন যে অপর লোকের চোক টাটায়, সরল-হৃদয়া মাধুরী কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারে না। হায় রে, এ জগতে সমবেদনশীল লোক নিশ্চয় নিতান্ত দুর্লভ! বাবু এত বুঝেন, কিন্তু তিনিই যে সময়ে সময়ে আকারে ইঙ্গিতে আভাষে একথা বলেন, এটা মাধুরীর চিরদিন মনে থাকিবে! আবার, অন্দরের সামিল পশু পক্ষীশালা, বাগান পুকুর, প্রভৃতি

দেখা শুনা কাজ-তো বেতনভুক্ দাস দাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে, তারা বসিয়া বসিয়া কি করে? এত গুলো লোকই বা কি জন্য? অনেককে বিদায় করিয়া দিলেও যারা বাকী আছে, তারাও কি যথেষ্ট নয়? আর তা বলিয়া এ সকল দেখিয়া শুনিয়া সময় নষ্ট করা মাধুরীর কোষ্ঠীতে কখনো লেখা নাই! আচ্ছা, তোমরাই কেন ভেবে দেখ না তাঁর সময়ই বা কোথায়? বেলা এক প্রহরের পর নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিতেই তো মধ্যাহ্ন অতীত হয়; তার পর আহার অন্তে চুল শুকান, বৈকালিক নিদ্রা, পরে জলযোগ, সমবয়সীদের সঙ্গে দু চার্টা খোস গল্প করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসে। চুল বাঁধা, গা ধোয়া, গহনা বস্ত্র পরা, এ সব অত্যাবশ্যকীয় নিত্য-কর্ম্ম করিতে না করিতে, রাত্রের আহার করার সময় উপস্থিত হয়। তবে কি শয়ন করার সময় এ সমস্ত কাজ করিতে হইবে না কি? যদি কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা এত-সব দেখিয়া শুনিয়া করিয়া থাকেন, তিনি কাজে নিশ্চিত নীচবংশোদ্ভবা। নচেৎ, এ সকল কাজ কি উচ্চবংশীয়া কেহ কখনো করিতে পারে গা? যদি বল—নিরুপমা করিত কেন? এ কথারও কি জবাব দিতে হইবে? নিরুপমা তো নীচ বংশ-জাতই ছিল বটে। নৈলে—আ ছি ছি ছি! তিন বৎসর মাত্র যাইতে না যাইতে কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া, বিস্তর অলঙ্কার-পত্র চুরি করিয়া, নিজের কর্ম্মদোষে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়া,

দ্বিপ্রহর নিশিতে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিদেশ গমন কি সহজ কথা! না, যার তার কর্ম্ম? এই রকমে পিঞ্জর-মুক্তা স্বাধীনা হইয়া ভিখারিণী সম্প্রদায়ের রাণী সাজিয়া ডাকাবুকো মাগী যে কাল কাটাইতেছে, আর একজন বৈষ্ণব যুবকের সঙ্গে যে নবদ্বীপধামে পরম সুখে বসবাস করিতেছে, ইহা সে দিন বৃত্তি লইতে আসিয়া মাধুরীর একজন নিকট-আত্মীয়—সেও বাপু, যে-সে-আর কেউ নয়, পিস্‌তুত ভাইয়ের মামা-শ্বশুরের ভিক্ষাপুত্র—স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছে! বাবু তো মাগীকে টাকা কড়ি, গহনা বস্ত্র, জমিদারী পর্য্যন্ত দিতে কসুর করেন নি, মাধুরী সে সব কথার আগা গোড়া অনেক দিন শুনিয়াছে। নির্ব্বিঘ্নে সুখ স্বচ্ছন্দে অন্য লোককে লইয়া সে সকল ভোগ দখল করিবে ভাবিয়াই তো সে মাগী এমন স্বর্গপুরী হইতে পলাইয়া গেল! বাবুর কথাই বা কত বলিব? তিনি যে কি গুণে—বুঝি বা কটা চামড়া খানা দেখে—মোহিত হ'য়ে একটা পথের ভিখারিণীকে রাজরাণী ক'রে এনেছিলেন, তা তিনিই কেবল ব'ল্‌তে পারেন। আবার, অতবড় অভিধান খানা খুঁজে আদর ক'রে মলিনার বদলে নিরুপমা নাম রাখা হ'য়েছিল। তা, এ সকল কাজে নামটা সার্থক হ'য়েছে বটে—বলেন "নিরুপমা" কি না যার তুলনা নাই—কথাটা ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক! আমি ভুল বুঝেছি রে উল্টো বুঝেছি! যে নাম রেখেছে তার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান খুব বেশী বটে! তোরা কি বলিস্‌রে অমলা বিমলা!

সাবেক গিন্নী ঠাক্‌রুণের রূপ-গুণের সীমা ছিল কি? তোরা কিছুই জানিস্‌নে—বটে! তা ব'ল্‌বি না তো কি? খোসামুদী আর কাকে বলে? অনেক টাকা কড়ি গহনা বস্ত্র ঘুস মেরেছিস্‌ কিনা! আরো বেশী নেমকহারামী কি ক'র্ব্বি? তোরা তো আর পুরুষ মানুষ নোস্‌ যে, পুরুষের মন বুঝ্‌বি? ধন্য যা হোক্‌! এমন পুরুষের খুরে দণ্ডবৎ! গুণের বালাই নিয়ে ম'র্‌তে ইচ্ছা করে রে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গরবিণী মাধুরী আত্মীয় স্বজনে পরিবৃতা হ'য়ে মধ্যে মধ্যে, ছুতায় লতায়, এইরূপ আন্দোলন আলোচনা করিত, পাঠক পাঠিকারা অবশ্যই এটা বুঝিতে পারিতেছেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস—কার্য্য-দৃষ্টান্তে।

পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনা পরম্পরা যদি স্বধু বাক্যে শেষ হইয়া কার্য্যে পরিণত না হইত, তাহা হইলেও আমাদের কোনো কথা বলিবার অধিকার থাকিত না। কারণ, সভ্য অসভ্য সকল দেশে সকল সমাজে প্রবলা রমণীরা দুর্ব্বল বা সপত্নী সম্বন্ধে চিরকাল এই রকম বলিয়া থাকেন—কাজেও করিতে ত্রুটি করেন না; পূর্ব্ববর্ত্তী কাহারো গুণ-সূর্য্য কলঙ্ক-মেঘে না ঢাকিলে বুঝি বা তাঁদের নিজেদের গৌরব-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র বাক্য-বাণ হানিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা মাধুরীর মতন প্রকৃতির রমণীর কার্য্য বা সাধ্য নয়। তাঁহার বিবাহের পর আনন্দ কুটীরে আসার কিয়দ্দিন পরে একদিন অধিক রাত্রে রামানন্দ বাবুর সঙ্গে আলেখ্য-গৃহ দেখিবার সময়, মাধুরী ভাল করিয়া দেখিবার ছলে সপত্নীর প্রতিমূর্ত্তিখানি নীচে নামাইতে অনুরোধ করিল। সরল-মনা রামানন্দ স্ত্রী-চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া নিজেই উচ্চ স্থান হইতে ঐ মূর্ত্তিখানি নামাইতে গেলেন। তিনি একাকী পারিবেন না বলিয়া যেন ভয় পাইয়া মাধুরী তাঁহাকে সাহায্য করিতে গেল। গিয়া, সে নিজেই যেন বেশ ভাল রকম ভার বহন করিতে পারিতেছে এইরূপ ভাণ করিয়া ছবিখানি হঠাৎ উল্টাইয়া ফেলিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। অবাক্ রামানন্দ দু-একটা প্রতিবাদের কথা বলিতে না বলিতে ক্রোধ-বিবশা আরক্তনয়না মাধুরী আপন বামপদ প্রতিমূর্ত্তির মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া উহা

বিকৃত—একেবারে বিধ্বস্ত—করিল এবং স্বভাব-সিদ্ধ গর্ব্বিত বচনে বলিতে লাগিল, "যে লোক যেখানকার উপযুক্ত সে সেইখানে যায় সেইটাই ভাল ; তা না হ'লে নানারূপ বিষময় ফল উৎপাদিত হইয়া সমস্ত নষ্ট করে। উচ্চ রায়বংশের মহিমান্বিত স্ত্রী-পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি সকল মধ্যে, হংস শ্রেণীর মধ্যে বায়সীর মতন, এ খানা কি এখানে ভাল দেখায়, বল তো শুনি? যখন আসলই জন্মের মতন গেল, তখন আর তার নকল রেখে ফল কি? ভদ্র-ঘরের কলঙ্ক-কথা খুব কৌশলে স্মৃতি-বহির্ভূত করাই প্রশস্ত উপায়। যে তাহাকে দূর করিয়া রূপ-গুণ-কুল-শীল-বংশগরিমায় প্রধান পদ লাভ করিয়াছে, এ ঘরে তার প্রতিমূর্ত্তি রাখাই সঙ্গত। তুমি যদি মানুষ হও—যথার্থ পুরুষ হও—তাহা হইলে সেইমত কাজ কর। এতদিন নিজের বুদ্ধিতে বুঝিয়া কেন যে কর নাই ভাল বুঝিতে পারি না ইত্যাদি।"

এতদ্রূপ কথার এবং কাজের পর কি আর প্রতিবাদ সম্ভবে? মাধুরী যেমন যেমন বলিল, কাজেও ঠিক সেই রকম ঘটিল। এবং এবম্বিধরূপে মলিনীকৃত, চূর্ণ-বিচূর্ণ নিরূপমার প্রতিমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ তার পরদিন প্রাতঃকালেই গৃহ-জঞ্জালের সঙ্গে বহির্নিক্ষিপ্ত হইল। আবার, মাসদ্বয় মধ্যেই সুনিপুণ চিত্রকর কর্ত্তৃক মাধুরী দেবীর এক প্রতিকৃতি নূতন ধরণে প্রস্তুত হইয়া তৎস্থান অধিকার করিয়া অধিকারিণীর রূপ-মাধুরী অবিচ্ছেদে দর্শক সকলকে দেখাইতে লাগিল। আর, যুবতী-রূপ-মুগ্ধ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র রামানন্দ বাবুর

কার্য্য-প্রণালী-দর্শনে বন্ধুবান্ধবগণ সমেত সকল লোকই যে হাস্য পরিহাস করিতে ছাড়িল না, ইহাও তৎ-সময়ের একটী বিশেষরূপ ঐতিহাসিক রহস্য।

অমলা বিমলা সহচরীদ্বয়ের কি দশা হইল, সেটাও বোধ হয় এখানে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক নয়। অন্যান্য সাধারণ পরিচারিকা-দের মতন তত ঘৃণিত ও হীনদশাগ্রস্ত না হইলেও, তাহাদের এখনকার পদ-মর্য্যাদা বিশেষরূপ প্রলোভনের স্থল ছিল না। বর্ত্তমান কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিজের কার্য্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততক্ষণ ছাড়া তাহারা তাঁহার নিকট এক মুহূর্ত্তও অধিক কাল থাকিতে পারিত না। যে কথাটা না বলিলে বা না জিজ্ঞাসা করিলে নয়, তাহারা স্থধু তাহাই বলিতে, শুনিতে বা করিতে পাইত, তদপেক্ষা বেশী কিছুতেই নয়। পূর্ব্ব গৃহিণীর নাম গন্ধ বা তৎসম্পর্কে কোনো রকম কথা কোনো সূত্রে বলিবার যো কাহারো ছিল না। নিরুপমা তাহাদিগকে যেমন কোনোমতে পরিচারিকা না ভাবিয়া নিজের সহোদরা ভগিনী অথবা প্রিয় সহচরীর মতন স্বব্যবহার করিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাহারা শত শত বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিত; পরস্পর নির্জ্জনে কতবার হা হুতাশ করিয়া সময়ে সময়ে কাঁদিত পর্য্যন্ত। উচ্চ অথচ অধুনাতন দরিদ্র বংশে না জন্মিলে, মাতা পিতা স্বামীর আশ্রয়-হীন না হইলে, তাহারা অনেক কাল অন্যত্র চলিয়া যাইত; এ সকল কষ্ট গঞ্জনা

সহ্য করিয়া কখনো তিষ্ঠিতে পারিত না। কিন্তু শুধু মুখে বলা তো সহজ কথা, হঠাৎ তারা যাইবেই বা কোথায়? দেশ কাল পাত্র, আপনাদের তরুণ বয়স বিবেচনায় ও অন্য সুহৃৎগণের সুপরামর্শে মনের ক্লেশ মনেই গোপন রাখিত এবং যেরূপে হউক যে দিন সুভালাভালি কাটে, সেই দিনই ভাল, এমনি ভাবে সশঙ্কিতচিত্তে কোনো রকমে কাল কাটাইত। সুতরাং নিরুপমাকে দেবীজ্ঞানে যে পরিমাণে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইত, মাধুরীকে পিশাচী ভাবিয়া তাহার শত সহস্র গুণ অধিক ঘৃণা করিত। কেবল, ভয়ের চোটে, কোনো কথা ফুটিয়া বলিবার, বা কোনো কাজে কিছু দেখাইবার, যো ছিল না। তাহা হইলে আনন্দ-কুটীর হইতে সেই দিনই তাহাদের অন্ন উঠিত ইহা বেদ-বাক্যের মতন সুনিশ্চিত অকাট্য সত্য। আবার, বরং কর্ত্রী ঠাকুরাণীর তেজ কোনোরূপে সহ্য হইত, কিন্তু তাঁর পিত্রালয়ের আদরের বিশ্বস্তা দাসী জয়ঙ্করীর মুখের কাছে দাঁড়ায়, কাহার্ সাধ্য? মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কিরণ বরং মনুষ্যের সহনীয়, কিন্তু তত্তেজে উত্তপ্ত বালুকারাশি অধিকাংশ সময়ে ভ্রমণকারীর চক্ষু হইতে জল টানিয়া বাহির করে। প্রকৃতির এ অকাট্য নিয়মটা, বোধ হয়, অনেকেরই অজ্ঞাত নহে। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, একের সহিত অন্যের তুলনা না করিলে পরস্পরের তারতম্য বুঝা যায় না। এজন্য চলিত কথায় লোকে বলে "দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না।"

তার পর স্ত্রী-চরিত্রের কথা। যাহার অস্তিত্ব, যাহার বিশেষত্ব, যাহার পরিমাণ বা সীমা "দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" রূপ একমাত্র সংক্ষিপ্ত শ্লোকে বহুদর্শী মহাজন বহু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; যে সম্বন্ধে নানা কথা, নানা প্রবন্ধ, নানা তত্ত্ব লিখিয়া শেষ-মীমাংসা করিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞ কবি "Frailty ! thy name is woman" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সারিয়াছেন, সর্ব্বদেশে সর্ব্ব ভাষায় নানারূপে বিবৃত হইয়া যাহা ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, হাজার বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সংসার-তত্ত্বদর্শী হইলেও রামানন্দ রায় যে তাহা বুঝিতে—বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে—দফায় দফায় হা'র মানিবেন এবং তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজে বংশাবলী-ক্রমে বিদ্যমান থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। তাঁহার বিচিত্র চরিত্রে অনেক শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে ইহা সুস্পষ্ট সত্য। পিতা পিতামহ বা অন্য নিকট-অভিভাবক দ্বারা লালিত পালিত না হইলে, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বাল্যকালাবধি অনুকরণ না করিলে, বুঝি মানুষের এই রকম দশাই ঘটে। বাহিরের শিক্ষা কয়টা লোকের ভাগ্যে সুফল প্রদান করে, বল দেখি শুনি ?

তৃতীয় উচ্ছ্বাস—আনন্দ-উৎসবে।

আনন্দপুরের আনন্দ-কুটীরে আ'জ্ আহ্লাদ আমোদের সীমা পরিসীমা নাই! চারিদিকে বাদ্যভাণ্ড, নৃত্যগীত, পূজা হোম যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, আদায় বিদায়—লোকজনের হুড়াহুড়ি, টাকা কড়ি সাল রুমাল বস্ত্র অলঙ্কার তৈজস পত্রের কাড়াকাড়ি, তৈল হরিদ্রা দধি মাল্য ধান্য দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের ছড়াছড়ি—যেন কুবেরের ভাণ্ডার বিতরিত, যেন অশ্বমেধ, রাজস্য় বা অন্য কোনো ব্যয়-সাধ্য কৃচ্ছানুষ্ঠিত বৃহৎ যজ্ঞ বাড়ীতে! কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ পরিতেছে, কেউ বা হাসিতেছে, কেহ যেন অল্পাধিক অসন্তুষ্ট—বুঝি আহার ব্যবহার, বিদায় আদায়, প্রাপ্তি দান মনোমত হয় নাই। কিন্তু এ সকল উৎসব অনুষ্ঠান কিসের বা কাহার জন্য? এ জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই অ-প্রাসঙ্গিক নয়। কেহ জানিতে উৎসুক হইলে নিশ্চিতই অন্যায়-অনুসন্ধিৎসু বলিয়া অভিহিত হইবেন না।

অতএব সংক্ষেপে বলা ভাল, যে, রামানন্দ বাবুর বাড়ীতে একটা অলৌকিক অথচ প্রয়োজনীয় কাণ্ড সম্প্রতি সুনির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। সেটা তেমন বেশী কিছুই নয়—যথা সময়ে কাঁচা পাকা "সাধ" খাইয়া, গর্ভাধান পঞ্চামৃত প্রভৃতি সকল রকম শাস্ত্রীয় এবং ব্যবহারিক মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান অন্তে, অতি কষ্টে সৃষ্টে, প্রাণ-যায়-যায় রকমে, কতিপয় মাস নেহাৎ না কাটাইলে নয় তাই

—"গেলুম রে, মলুম রে, মা গো, বাবা গো, এস গো, দেখ গো, রাখ গো" ইত্যাদি রকমে মৃত জীবিত, দূরগত নিকটস্থ, আত্মীয় স্বজনকে স্মরণে আহ্বানে আপ্যায়িত করিয়া; হুলুধ্বনি শঙ্খ, ঢাক ঢোল, নহবৎ কাঁসি, শানাই বাঁশী বাজার মধ্যে, শ্রীমতী মাধুরী ঠাকুরাণী একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। ছয় মাস অন্তে অদ্য তাহার শুভ অন্নপ্রাশন। যেটেরা পূজা, আটকৌড়া, ষষ্ঠী পূজা, প্রভৃতি অশেষ বিশেষ, শাস্ত্রীয়, কৌলিক, ব্যবহারিক, মধ্য সময়ের অনুষ্ঠেয় সকল কাজকর্ম্মই যথা-নিয়মে প্রয়োজন-মত বিশেষ-তত্ত্বাবধানে, অথচ খুব ধূমধামে সুসমাহিত হইয়া গিয়াছে। তবে অবশ্য ঠিক এ কালের মতন ভাবে নয়। যেহেতু, এখনকার দিন হইলে "তারের খবর" অথবা ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠে পাঠক পাঠিকারা এ সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য টাট্‌কা রকমে সদ্য-সদ্যই ইহার অনেক অগ্রে জানিতে পারিতেন। প্রসব-কারিণী, শুশ্রূষা-যোগ্যা সূতিকাগারে লোকের ও স্তনদায়িনী ধাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দৃষ্টেও অন্ততঃ কতক অনুমান করিতে পারিতেন। বড় দুঃখের বিষয়, মাধুরীর গর্ভধারণ, পুত্রপ্রসবাদি রূপ সময়ে—পোড়া সেকালে—এদেশে এ সকল উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। ঘরে ঘরে জানাজানি, কানাকানি, বলাবলি; ধোপা, নাপিত প্রভৃতি পোষ্য ইতর শ্রেণীর লোক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ ও প্রাপ্তি ছাড়া জানা-শুনার অন্য কোনো সুগম উপায় তৎকালে কিছুমাত্র ছিল না;

সরকারী ডাকযোগে পত্রাদি প্রাপ্তি তো দূরের কথা। বঙ্গদেশ সবেমাত্র মুসলমান নবাবের হস্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া বণিকবেশী ইংরাজদের করায়ত্ত হইয়াছে। উন্নতি দূরে থাকুক, রাজ্য শাসন, প্রজা পালন, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিশেষ রূপ অবনতি! এ রকম সময়ে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে আবহমান কাল যেরূপ হইয়া থাকে, তদনুসারে লুট তরাজ, খুন দাঙ্গা, চৌর্য্য অবিচার প্রভৃতি দেশের চারিদিকে দেখা শুনা যাইত! তখন এর-ওর-তার মুখই লোকের সংবাদপত্র; ভাট নাপীত প্রভৃতি যেন তারের খবর; বৈটকখানা, আটচালা, বকুলতলা, তাস দাবা পাশা খেলার আড্ডা ও স্নানের ঘাট বা নিমন্ত্রণের বাটী প্রভৃতি বিচার আন্দোলনের স্থল; গ্রামের পঞ্চায়েৎ, মোড়ল অথবা জমিদার সমাজের বিচারক; তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রযুক্ত জরিমানা বা অন্যবিধ দণ্ডই শেষ দণ্ড— তাহার "আপীল" অর্থাৎ পুনরায় বিচার অন্য কোনো রকম সরকারী আদালতে আর হইত না। মুসলমান নবাবদের আমলের চেয়ে ইংরাজ বাহাদুরের আমলে এ সকল বিষয়ে কিন্তু খুব উন্নতি হইয়াছে, ইহা দেশের তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার কোনো কোনো স্থলে ইহার অল্পাধিক ব্যতিক্রমও যে দৃষ্ট হয় না এমন নয়, এটাও বক্তব্য।

দেশের তদানীন্তন অবস্থা এইরূপ। অবস্থানভিজ্ঞ অথবা খাস সহরবাসী কেহ কেহ হয়তো এ সকল কথায় মুখ নাসা কুঞ্চিত

করিলে করিতে পারেন; কিন্তু আমরা যাহা লিখিতেছি, ইহাই বাস্তবিক প্রকৃত অবস্থা। সুতরাং বিস্তর জীর্ণ শীর্ণ, কীটদষ্ট, হাতে-লেখা পুথি ঘাঁটিয়া—তাহারও অধিকাংশ বুঝিতে না পারায় কষ্টে পাঠ করিয়া কিম্বা বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া,—এরূপে না লিখিলে কেহ এ জনমে এ সমস্ত সাময়িক ঘটনা-কথা জানিতে পারিতেন কিনা তদ্বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আছে। আবার, তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের এত অধিক বহুল-প্রচার দূরে থাকুক, এদেশে উহার প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল কিনা বলা সুকঠিন। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ প্রথম-সভ্যতা-উন্নত বাঙ্গালা দেশে—তো হয় নাই, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী পাশ্চাত্য-দেশের কথা স্বতন্ত্র। তখনকার পাঠ্য গ্রন্থনিচয় তালপাতা, ভূর্জ্জপত্র বা এতদ্রূপ কোনোরকম আকারে লৌহ খুন্তী বা আল্‌তা দ্বারা লিখিত হইত, সকলেই জানেন। ইদানীং—মুসলমানদের আমলে—আদালত প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় সর্ব্বকার্য্যে কাগজে-লিখন-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল এমনই অনুমান ও নির্দ্ধারণ করা অসঙ্গত নয়। এখনো উড়িষ্যা প্রদেশে তাল পাতার উপর খুন্তীর মতন লৌহদণ্ডে লিখিত পুথি, হিসাব এবং জমিদার সরকারের দাখিলা প্রচলিত দেখা যায়। বহুকালাবধি তালপাতের উপর সুন্দর কালিতে লিখিত চণ্ডী না হইলে যথা-শাস্ত্র পাঠ সিদ্ধ হয় না, বাঙ্গালা অঞ্চলের অনেকেই এটা দেখিয়া শুনিয়া থাকিবেন। এ সকল বিষয়ে আর্য্য-

জাতির কীর্ত্তি কি অযশ কোন্‌টা গান করিবেন, গ্রন্থকার তাহা সঠিক বলিতে পারেন না। সেটা সময়ের তথা পাঠ্য-সমাজের রুচির উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

মনের আবেগে আমরা "ধান ভান্তে শিবের গীত" নামক প্রবাদের মতন কি লিখিতে কি লিখিলাম বুঝিতে পারিতেছি না। পাঠক পাঠিকারা এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু এই সকল কথা নিতান্ত আনুসঙ্গিক, সুতরাং ধরিতে গেলে গ্রন্থের পক্ষে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন "গ্রন্থকারের বয়স হইয়াছে। নব রুচি এবং আধুনিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কতকটা অনভিজ্ঞ। অতএব এ সকল অনর্থক কথা ছাড়িয়া আসল ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করাই উচিত কার্য্য।" এই শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাদের বিরক্তির ভয়ে, পরিত্যক্ত ঘটনা-সূত্রের "খেই" আবার ধরিয়া, পুনরায় গল্প আরম্ভ করিতে হইল।

রায়-বংশের এই আনন্দ-ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ মাধুরী দেবীর রাজত্ব আরম্ভের অনধিক কাল পরে, তৎ-পিতৃবংশের অনেক স্ত্রীপুরুষ জ্ঞাতি কুটুম্ব এক্ষণে নানা উপায়ে রায়-বংশের বৃত্তি-ভোগী হইলেন। ইঁহারা এরূপ অন্যের স্কন্ধে অধিষ্ঠান-করাকে দোষের কাজ মনে করিতেন না, অথচ উপযুক্ত সুযোগ অভাবে এ রকমের কাজ কৌলিক হইলেও এতদিন এ ক্ষেত্রে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই—এ কথা ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইলেও

এস্থলে বিশদরূপে বিবৃত করার প্রয়োজন। ফলতঃ ইহাদের সম্বন্ধে রায়-সংসারে নানারূপ বিধি ব্যবস্থা যে হইয়াছিল, ইতিহাসে এবং খাতাপত্রে এ রকম স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং কোনোমতে অবিশ্বাসের যোগ্য নহে। কাহারো বা বংশানুক্রমিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; কাহারো জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপযুক্ত মাসহারা; কাহারো নিষ্কর ব্রহ্মত্র বা দেবত্র ভূমি; অপর কোনো লোকের নগদ বা অলঙ্কার কিম্বা অন্য নানারূপে আয়বৃদ্ধি হইল। যাঁহারা অবীরা, বা, সংসার অভাবে যাঁহাদের ভাগ্যে কর্ত্তৃত্ব কি কর্ম্মত্ব জীবনের মধ্যে ঘটে নাই; অথবা যাঁহারা "আহা আমাদের মাধুরীর সংসারের জিনিসপত্র দেখা শুনা তদারক করার অভাবে অপরে লুটে খাচ্ছে; আমি (বা আমরা) না দেখ্‌লে শুন্‌লে আর কে ক'র্ব্বে, কে আর রাখ্‌বে ঢাক্‌বে" ইত্যাদি রকম স্নেহে গলিয়া যান, এমন অনেকে প্রথমে দুচার দিনের মতন বেড়াইতে বা দেখা করিতে কিম্বা আত্মীয়তা কুটুম্বিতা করিতে আসিয়া, যেন নিতান্ত উপরোধে বা কর্ত্তব্য-বোধে বাধ্য হইয়া, শেষে স্থায়ীরূপে দুটা চারিটা ঘর দখল করিয়া রহিয়া গিয়াছিলেন; যত্ন চেষ্টা দ্বারা রায়-বাড়ীর প্রাচীন ঘরগুলা বজায় রাখাও আবার অনেকের উদ্দেশ্য ছিল! কাজেই নিজ রায়-বংশের বহু দিনের আশ্রিত, অনুগত, প্রতিপালিত, অধুনা-দূরীভূত আত্মীয় বর্গের শূন্য স্থান অধিক কাল অনধিকৃত থাকে নাই। তবে এরূপ ঘটনা সম্বন্ধে রামানন্দ বাবুর কতটা

হাত বা ক্ষমতা এবং সম্মতি ছিল, সেটা বলা সুকঠিন। এস্থলে এটুকু বলা, বোধ হয়, অসঙ্গত নয়, যে, তাঁহার মতন অবস্থায় পড়িয়া দ্বিতীয় পক্ষে দার-পরিগ্রহ করা—তাও আবার যেমন-তেমন স্ত্রীর হাতে পড়া নয়—এবং তখনকার সমাজ-প্রচলিত একান্ন-বর্ত্তিতা ও অনুগত-প্রতিপালন সূত্রে তিনি যে জানিয়া শুনিয়াও কতক পরিমাণে "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" ভাবে কাল কাটাইতেন, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ ঘটনা বড় বড় জমিদার আর রাজবংশের যেন কৌলিক-প্রথা, প্রাচীন পরিবার মধ্যে এখনো ক্বচিৎ এমন দেখা শুনা যায়। বহুদিনাবধি এদেশে "ঘরজামাই" থাকিবার প্রথা বিদ্যমান আছে, কিন্তু এ রকম "ঘরশ্বশুরে" থাকার কথা কৈ বড় একটা দেখা শুনা যায় না। যদিও পূর্ব্বে ছিল এমন হয়, এখন কিন্তু তাহার নিশ্চিতই বিরল-প্রচার!

মাধুরীর পুত্রের নামকরণে বড় অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। একজনকে পদচ্যুত দ্বারা তৎস্থান অধিকারপূর্ব্বক স্বামীর প্রণয় পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া রাজ-রাজেশ্বরী রূপে নিজে আনন্দ-কুটীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই শুভ ঘটনার স্মরণার্থ মাধুরী বুঝি নিজ পুত্রের নাম "প্রেমানন্দ" রাখিলেন। কিন্তু এ নাম রাখায় মাধুরীর নিজের মনের অন্তস্তলে অন্য কোনো ভাব ছিল কিনা তাহা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী বিধাতা বৈ কে জানিবে? মানুষে তো জানিত না এটা খুব সুনিশ্চয়!

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম উচ্ছ্বাস—মাধুরীগুণকথনে।

এ পুস্তকে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বিবৃত হইয়াছে, সে সকলই পর্য্যায়-বদ্ধ; অথচ তাহাতে এমন কোনো ঘটনা লিপি-বদ্ধ হয় নাই, যাহার উল্লেখ-করণে লেখককে ঘাড় হেঁট করিতে বা লিখিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। আর কিন্তু চলে না। আবার, বাদ দিলেও গল্প অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং এবারে অন্য রকমে পট পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

এ সংসারে পাপের চিত্র যে যে রকম উপায়ে দেখানো যাইতে পারে, সিদ্ধ-হস্ত লিপিপটু চিত্রকরেরা তৎসমুদয় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত ও লিপি-চাতুর্য্যে প্রতিফলিত করিয়া লোকের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টার ক্রটী করেন না। অনেকের মতে, পাপসম্বন্ধীয় ঘটনার যথাযথ বর্ণনায়—সামাজিক দোষ সমূহকে যথার্থ বর্ণে চিত্রিত করায়—নীতি-শিক্ষা দান অপেক্ষা পাপের পথ প্রদর্শনই অধিকরূপ সম্ভব। দুগ্ধে জল মিশাইলে হংস জল-ভাগ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সার-ভাগ মাত্র পান করে, অপর কোনো প্রাণী যেমন তাহা কখনো পারে না;

মানব-চরিত্র হইতে পাপের অংশ বাদ দিয়া গুণের সারভাগ গ্রহণে অনেকেই সেইরূপ সমর্থ হন না। তদপেক্ষা, সুধু সৎদৃষ্টান্ত দেখাইয়া বা সমাজের আদর্শস্থল সুচরিত্র অঙ্কিত করিয়া তৎসাহায্যে নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মপথ প্রদর্শনই, অন্যের মতে, সমাজ সংস্কারের প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা এ দুইটী পন্থার কোন্‌টী অবলম্বন করিয়া মাধুরীর চরিত্র-কাহিনী পাঠক পাঠিকার গোচর করিতে সমর্থ হইব, সেই চিন্তাই আমাদের মনে প্রবল হইয়াছে; অথচ না বলিলে নয়, এজন্য ঘটনা-পরম্পরা যথানিয়মে পর্য্যায়-মত না লিখিয়া অন্য উপায়ে বিবৃত করাই সুযুক্তি বোধ হইতেছে। সুতরাং, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সকলকে কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে হইবে; তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

আনন্দপুরে রায়-বাটীর অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান ছাড়া স্থানে স্থানে—প্রায় প্রতি ভদ্রপল্লীতে—আরো অনেক উদ্যান ছিল। পুষ্করিণী ও দেবালয়-প্রতিষ্ঠা এবং তৎসংক্রান্ত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা, তখনকার লোকে একটা বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তদনুসারে রায়বংশের কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রায় সকলেই—নিজ নিজ রুচিমত প্রধান প্রধান দেব দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির-সংলগ্ন সরোবর ও উদ্যান, প্রাচীর-বেষ্টিত করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই সকল বৃহৎ সরোবরের চারিধারে যে সকল বাঁধানো ঘাট ছিল, তাহাতে গ্রামের অনেক স্ত্রী

পুকুরে স্নান এবং সুবিধাবোধে পত্র ফুল ফল আহরণ করিয়া দেবার্চ্চনাও করিতেন। তা ছাড়া, মধ্যে মধ্যে "বন-ভোজন" নামক সাময়িক মিলন দ্বারা স্ত্রীলোকগণের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ, একত্র ভোজন তথা নানারূপ আমোদ প্রমোদের বেশ সুযোগ হইত; অথচ তাহাতে কেহ কখনো নিষেধ করিত না। তবে যে সকল উদ্যানে দেব-মন্দির ছাড়া গো, অশ্ব, হস্তীশালা বা অতিথি সেবার বন্দোবস্ত থাকিত, কিম্বা যাহাতে পল্লীস্থ মধ্যবিৎ ও ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা জল ব্যবহারার্থ দুই বেলা আসিতেন, অযথা-সংঘর্ষ-ভয়ে সেখানে ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই আসিতেন না; প্রয়োজন-বোধে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সময়ে তত্রত্য দেব দেবী দর্শনে বা পূজা করিতে যাইতেন মাত্র। গ্রামের ভদ্র-সমাজের অভিমতানুসারে স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাটে কদাচিৎ কোন পুরুষ যাইতেন না। সুতরাং সেই সেই পল্লীর নারীগণের জলবিহার বা বিশ্রম্ভালাপের পক্ষে প্রায়ই কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটিত না।

বন্ধু ধীরেন্দ্র সহ রামানন্দ রায় একদিন যখন এইরূপ একটী প্রমোদ-উদ্যানে বেড়াইতে আসিলেন, তখন বেলা অপরাহ্ন; পশ্চিম গগনে জবাকুসুম-সঙ্কাশ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেব প্রায় অস্তাচল-গত! নানাজাতীয় পক্ষীকুল সুমধুর কাকলি-ধ্বনি করিতে করিতে আপন আপন কুলায় গৃহে ফিরিতেছে। গোচারণের 'মাঠ' হইতে কোমল তৃণভক্ষণে পূর্ণোদর পয়স্বিনী-গাভীগণ ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে হাম্বা হাম্বা

রবে গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিতেছে। তাহাদের দ্রুতগমন-জনিত খুরোত্থিত ধূলিরাশিতে সান্ধ্য-গগন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে গোধূলিলগ্ন নাম যেন সার্থক হইয়াছে। উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্পবাটিকায় বিবিধবর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সুগন্ধ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষের সুন্দর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। সান্ধ্য-বায়ু তাহাদের সঞ্চিত গুপ্ত সৌরভ-ধন হরণ করতঃ মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া যেন হাস্যমুখে সকল প্রাণীকে কিছু কিছু অংশ বিতরণ করিতেছিল। সায়ং-শোভা-দর্শনে বিমুগ্ধ-চিত্ত বন্ধুদ্বয় ধীরে ধীরে একটী বাঁধানো বকুল বৃক্ষতলের চাতালের উপর উপবেশন করিলেন। রামানন্দ রায়ের আর সে রাজ-শ্রী নাই। যে কমনীয় মূর্ত্তিদর্শনে আপামর সাধারণ সকলেই ভাবিত তিনি বুঝি শাপভ্রষ্ট পার্ব্বতীকুমার বীর কার্ত্তিকেয় অথবা ইন্দ্রতনয় কুমার জয়ন্ত; কিম্বা পুনর্মানবদেহধারী অনঙ্গ; রোগে, শোকে, চিন্তায়, বিষাদে, অপমানে, মনের ঘৃণায়—পরিশেষে বিষম অনুতাপানলে দগ্ধ—সেই কান্তি-পুষ্ট সুঠাম সুন্দর দেহ-যষ্ঠি একেবারে জীর্ণ শীর্ণ মলিন নিষ্প্রভ হইয়া কঙ্কাল মাত্র সার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিচিত কেহ হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারিত কিনা সন্দেহ। তাঁহার বয়স যেন দশবৎসর অগ্রসর হইয়াছে; যেন মধ্য-যৌবনেই তিনি বিগত-বয়ঃ প্রৌঢ়-বয়স্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ধীর ও স্থিরভাবে তাঁহাকে বসিতে দেখিয়াও ধীরেন্দ্র বাবু প্রথমে সাহস করিয়া কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। বাল্যাবধি

ধীরেন্দ্রনাথ রামানন্দের সহাধ্যায়ী, সমপ্রকৃতিক, সমধর্ম্মা, পরামর্শ-দাতা, অকৃত্রিম বন্ধু ; বিদ্বান ও সুবুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত ; নিজ পিতৃ-বিয়োগের পরে সহকারী হইতে প্রধান দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়া তিনি অতি সুন্দর রূপে সকল কাজকর্ম্ম চালাইতেছেন। রামানন্দ রায়ের স্বভাব এবং মেজাজটা কিয়ৎপরিমাণে অন্যরূপ না হইলে—সমস্ত কাজ কর্ম্মে তিনি ধীরেন্দ্র বাবুর যুক্তি গ্রহণ করিয়া চলিলে—রায়-বাটীর কার্য্যমাত্রই বুঝি নিখুঁত সুন্দর ভাবে চলিয়া যাইত ! এক্ষণে তাঁহার সাংসারিক কোনো রকম অভাব বা কাহারো সহিত কোনো অকৌশল উপস্থিত না থাকিলেও সকল দিকেই যেন শূন্য উদাস ভাব ; তাঁহার সব থাকিয়াও যেন কিছুই নাই। যেন এক অভাবে অত বড় বৃহৎ পুরী জন-হীন ; যেন লক্ষ্মী অভাবে সংসারটায় কাহারো কোনো সুখ স্বস্তি শান্তি নাই। রামানন্দের বাল্য ও যৌবন অবস্থায় যে সমুদয় আত্মীয় স্বজন সকল দিক্ দেখিতেন শুনিতেন, মাধুরীর রাজত্ব-সময়ে তাঁহাদের অধিকাংশই দূরীভূত হন, এ কথা ইত্যগ্রেই বলা হইয়াছে। যে সকল আত্মীয়কে তাড়ানো কোনো মতে সম্ভব নয়, তাঁহারা কোনো গতিকে বৎসর কয়েক নির্লিপ্তভাবে যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহারাও ক্রমে ক্রমে হয় গতাসু, নয় দূরতীর্থবাসী হইয়া মায়া-জাল হইতে একপ্রকার নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাধুরীর অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানের পর, তৎ-মাতৃ-পিতৃবংশীয়গণকে কেহ কোনো

কিছু না বলিলেও প্রায় বেশীর ভাগ আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। কেননা, এত বড় একটা অহেতু-কলঙ্কের ডালি মস্তকে লইয়া কেহই বেশী দিন যে সেখানে থাকিতে পারিবে, এটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। রামানন্দ বাবুর নিষেধ-মতে কাহারো পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি কোনো রকমে কিন্তু হ্রাস হয় নাই। তবে, যিনি বা যাঁহারা নিজে হইতে কিছু না লইতেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

দুইজনে বহুক্ষণ স্থির নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকার পর রামানন্দ রায় নিজেই কথা কহিলেন :—"ভাই ধীরেন্দ্র, আমার আসন্নকাল যে ক্রমে নিকটবর্ত্তী, তোমরা কেহই সেটা বুঝিতে পারিতেছ না। যে সংস্কৃত কবি বলিয়া গিয়াছেন 'চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী,' তাঁর মতন বহুদর্শী বিজ্ঞতম পণ্ডিত খুব কম দেখা যায়। অন্য কেউ হউক না হউক, একমাত্র আমিই তাঁহার এ কথার পূর্ণ সমর্থক—জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল। শুনিয়াছি, আগ্নেয়-গিরির অভ্যন্তর-প্রদেশে নানারূপ দাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে। আপাত-দৃষ্টিতে বাহির হইতে কেহই কিন্তু তাহাদের সত্তা বা প্রখরতা অনুভব করিতে পারে না। কেননা, পর্ব্বত পূর্ব্বমত যেমন তেমনি নিশ্চলভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে। আমার দশাও ভাই, বুঝি বা ঠিক সেইরকম। অবশ্য, কিছুদিন অগ্রে লজ্জায় ঘৃণায় আমি যেমন অধীর এবং কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম, এখন ক্রমশঃ তদপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু প্রবল ঝটিকা আগমনের পূর্ব্বে

সমস্ত প্রকৃতি যেমন স্থিরভাব ধারণ করে; অথবা নির্ব্বাণের অগ্রে দীপ যেমন হঠাৎ অধিকতর জ্বলিয়া উঠে, এটাও বুঝি বা সেইরকম। আরো ভাবিয়া দেখ——"

বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া ধীরেন্দ্র বলিলেন "মিত্র, অনেক দিন পরে তুমি বাটী হইতে বাহিরে আসায় আ'জ্ আমরা যেমন আনন্দিত, তোমার মুখে এই সকল জ্ঞানের কথা শুনে ততোধিক সুখী। অবশ্য, অতীত ঘটনার উপায় নাই। যে কলঙ্কের দাগ একবার কপালে বসিয়াছে, তাহা সহজে মুছিবে না। কিন্তু একটা কথা এই ভাবিতে হইবে যে, এ ঘটনা যে সুধু তোমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে এমন নয়। খুঁজিয়া দেখিলে অনেকানেক প্রাচীন বড় ঘরে এমন সব দুর্ঘটনা দৈনিক হইতেছে জানা শুনা যায়। আমার সামান্য বুদ্ধির মতে এ সকল বিষয় মনে স্থান না দিয়ে বরং উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। কেননা, তাতে সাধারণে বুঝ্তে পারে যে, তোমাতে মনুষ্যত্ব আছে——"

একটুখানি বিষাদমাখা ম্লান হাসি হাসিয়া রামানন্দ বাবু অতি ধীরে অতি মৃদু স্থিরভাবে বলিলেন, "যাহা ঈশ্বর ভিন্ন কেহই এতদিন জান্তে পারে নাই, যে কথা আমার অন্তরের অন্তস্তলে গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রের মতন গুপ্তভাবে পোষিত আছে, বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও প্রাণের বন্ধু তোমায় আ'জ্ আমি সে কথা বলিব। অন্য লোকে যাহা ভাবে ভাবুক, বা যাহা ইচ্ছা বলে বলুক, তাহাতে আমার

কিছুই যায় আসে না ; আমি সে সকলের ধার বড় একটা ধারি না। কাহার্ জন্যই বা ভাবনা করিব ? আমার আর এ জগতে কে আছে, বল ভাই ? যারে বলে 'ন পিতা ন মাতা ন পত্নী ন চ পুত্র কন্যকাঃ।' আমার সম্বন্ধে ঠিক তাই। যে সকল ঘটনা হ'য়ে ব'য়ে গিয়েছে, তারা আর ফির্বে না খুব সত্য। সত্য ব'লেই সে সম্বন্ধে কোনো কথা ভাবা ঠিক নয়, তাও জানি। কিন্তু সব জেনে শুনেও যখন মনে মনে এই রকম ভাবের কথা উদয় হয়, যে, এতদিনের প্রাচীন প্রখ্যাত রায়-বংশটা কেবলমাত্র একটী সন্তান অভাবে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে—তাও আবার শেষ বংশধরের নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায়—তখন আমার মনপ্রাণের অন্তস্তলে যে কিরূপ অনুতাপের তুষানল জ্ব'ল্তে থাকে, তা আর বিশেষভাবে কি বলিব ? আবার অন্যদিকে যখন ভাবি, আমি কি অমার্জ্জনীয় দোষ পাইয়া সেই অবলা সরলা নিরপরাধা একমাত্র পতিগতপ্রাণা নিরুপমা বালাকে পরিত্যক্ত ছিন্ন পাদুকাখণ্ডবৎ দূরে নিক্ষেপ করিলাম ; মুখ দেখিলে পাছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ত্যাগ করিতে না পারি, এই বিষম ভয়ে সে কাল-রাত্রির ঘটনার পর একবার চর্ম্মচক্ষের দেখাও দেখিলাম না ; তোমার মতন বুদ্ধিমান হিতৈষী বন্ধুর চিরদিনের উপদেশ, হিতকামনা, সংযুক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করিলাম ; বহ্নিমুখ-প্রবেশোদ্যোগী শলভবৎ শুধু বাহ্যিক রূপ দর্শনে তথা নিরুপমার অবাধ্যতার উপযুক্ত শাস্তি দিবার উদ্দেশে এককালে উন্মত্তপ্রায় হইলাম ; তখন

ভাই আমাতে আর আমি থাকি না। কিন্তু এখন সকলই বৃথা! জানকী-বিয়োগ-বিধুর রামচন্দ্রের মতন আমার কেবলমাত্র রোদন আর হা-হুতাশ সার দাঁড়াইয়াছে। অথবা, আমি নিতান্ত পাপিষ্ঠ যে, সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত নিষ্পাপ-চরিত্র রামচন্দ্রের সহিত নিজ চরিত্রের এবং অবস্থার তুলনা করিতেছি। কেননা, যে প্রথিতযশা মহাপুরুষ কেবলমাত্র প্রজারঞ্জন অনুরোধে প্রাণাধিক-প্রিয়তমা জানকীকে একান্ত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা জেনেও ত্যাগ করেন। আবার শেষে প্রয়োজন সত্ত্বেও শত শত উপরোধ অনুরোধে পুনঃ দার-পরিগ্রহ করেন নাই, অথচ বিধি ব্যবস্থা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই প্রিয়তমা সীতার কনক-প্রতিমা নির্ম্মাণ দ্বারা সস্ত্রীক হইয়া অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন; সেই পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্রে আর নরাধম আমাতে কি কখনো সাদৃশ্য সম্ভব? তার চেয়ে বরং গোপনে গান্ধর্ববিবাহকারী পরে পত্নী শকুন্তলা-ত্যাগী দুষ্মন্তরাজার সঙ্গে নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী আমার সঙ্গে একদিন তুলনা করিলেও চলে। কিন্তু দুষ্মন্তের সাপক্ষে যা হোক দুর্ব্বাসা-শাপরূপ একটা বিশেষ কারণ বিদ্যমান ছিল, হতভাগ্য আমার পক্ষে একমাত্র দুর্জ্জয় ক্রোধ আর প্রবল বংশাভিমান ছাড়া অন্য কিছুই বলিবার নাই——"

এখানে তাঁহার বক্তৃতা-স্রোত ভঙ্গ করিয়া ধীরেন্দ্র কহিলেন, "দেখ, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কতদিন হইতে মনে

মনে ভাবিতেছি, কিন্তু সময় ও সুযোগ পাই নাই বলিয়া জিজ্ঞাসা করা ঘটে নাই। পাছে নিরুপমার নাম করিলে তোমার মনে কোনো নূতন কষ্ট হয় এই আশঙ্কায়——”

বামানন্দ। (একটু উত্তেজিতভাবে) হাঃ কষ্ট—কিসের কষ্ট? তুমি এত জান এটা কি জানন‌া, যে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির দগ্ধস্থলে আগুনের তাপ যেমনটী ভাল লাগে, শীতল জল তার শতাংশের একাংশ নয়, বরং অনেক সময় তাতে বিপরীত ফল দেয়? আমার এখনকার দশাও ঠিক তাই। অবশ্য, আনন্দ-কুটীর হ'তে নিরুপমার গোপনে স্থানান্তর গমনের পরে একটা আপদ বিদায় হইল ভেবে আমি স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিলাম, সেটা খুব স্বীকার্য্য বটে। কিন্তু সে ভাব বেশী দিন মনে স্থান পায় নাই। ক্রমে যখন তুলনায় সমালোচনার সময় আসিল, তখন দেখিলাম, ভাবিলাম, আর বুঝিলাম—নিরুপমা নারীবেশে দেবী ছিল; আর যে তৎস্থান অধিকার করিয়াছে, সে পিশাচী, নারকী আর নারীবেশে প্রেতিনী। এতো গেল রূপগুণের তুলনা। ব্যবহারেও নিরুপমা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিল, তাহা বোধ করি, তোমরাও জান্‌তে পেরেছিলে——”

ধীরেন্দ্র। আমরা সব বুঝেছিলাম। কেবল কিছুতেই তোমার ভ্রান্তি-মোহ বিগত হয়নি এইটুকুই দুঃখ। চিরকাল সকল বিষয়েই তুমি যেমন আত্মাভিমানী, এবারেও সেই রকম ছিলে। সেই ভয়ে কিছু ব'ল্‌তে—

রামা। তখন যে আমি দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানপরিশূন্য বৃথা-মদোন্মত্ত মত্ত হস্তী ; তখন কি তোমার মতন প্রকৃত বন্ধুজনের প্রবোধ-অঙ্কুশ আমাকে কোনো কাজ থেকে ফিরাতে পা'র্ত্তো ? সে সময় এরূপ ক'র্ত্তে চেষ্টা না ক'রে বরং ভালই ক'রেছিলে। হয়তো, সে উন্মত্ত অবস্থায় তোমার মতন সূক্ষ্মদর্শী, বিবেচক, হিতৈষী বন্ধুর সঙ্গেও বিচ্ছেদ ক'র্ত্তে নিরস্ত হ'তুম না—

ধীরেন্দ্র। (সবিষাদে) স্বধু সেই ভয়েই তো কিছু বলিনি বা করিনি। বেশ জানতুম, এমন একটা দিন আ'স্‌বে, যখন তুমি নিজের ভ্রম নিজেই বুঝে সাবধান হ'তে পা'র্বে। দুবার বিবাহের পরিণাম যে এমন বিরুদ্ধ-ফল-প্রসবী হ'য়ে দাঁড়াবে, তা ঠিক বুঝে সাবধান হ'তে পা'ল্লে'ই, বোধ হয়, ভাল হ'তো—

রামা। তা হ'লে আমার পাপের উচিত শাস্তি এ জন্মে ভোগ-করা ঘটে কৈ ? আর, লোকে আমায় দেখে নানামতে শিক্ষা পায়ই বা কৈ ? আর কিছু জানি না জানি, বুঝি না বুঝি, এটা তো বেশ বুঝেছি, যে, এ জগতে নিজানুষ্ঠিত সকল কর্ম্মেরই ফলাফল-ভোগ ইহজীবনেই হয় ! স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মলোক, তপোলোক প্রভৃতি পাপ-পুণ্যভূমি সাধারণ লোককে স্বধু বুঝাবার আর প্রবোধ দিবার জন্য কবি-কল্পিত নানারূপ বিধি ব্যবস্থা মাত্র। ভেবে দেখ—

ধীরেন্দ্র। তা সে যা হোক, তোমায় আ'জ্‌ এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নিরুপমাতে কি এমন দোষ হঠাৎ

পেয়েছিলে, যে, তাঁকে জন্মের মতন ছেড়ে বিদেশে বাস, আবার একটা বিবাহ, তিনি বাড়ীতে থাকিতে বাড়ী ফিরিবে না প্রতিজ্ঞা ক'র্ত্তে হ'য়েছিল? যদি কোনো বিষয়ে তিনি প্রকৃতই দোষী ছিলেন এমন কিছু জেনে থাক, তার যথা-উচিত শাস্তি দিবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে তো খুব ছিল। স্বামী হ'য়ে স্ত্রীকে দণ্ডদান করা তো হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়—

রামা। এ সকলের সঠিক জবাব দিতে আমি একেবারেই অপারক। এই কয় বৎসরে বহু চিন্তায় আমি নিজে যে কথার একটুও মীমাংসা ক'র্ত্তে পারিনি, তার একটা যা-তা উত্তর কি দিব বল? দিলেও এখন তাতে লাভালাভ কি? আর কি, সে অতুল রূপরাশি এ চর্ম্মচক্ষে দেখিব? না, সে সকল গুণকথা স্বকর্ণে শুনিতে পাইব? আমি যে কি সার রত্ন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় হারিয়েছি, তোমায় ভাই কি ভাষায় সে সব কথা যে জানাবো জানিনা। প্রণয়ের প্রথম অবস্থায় যে দু-চারখানা পত্র পরস্পরে লেখালেখি হ'য়েছিল, চল, বাড়ী ফিরে গিয়ে সে সকল তোমায় দেখাইগে, আর সব অবস্থা শুনাইগে। তুমি নিজেই বিচার ও তুলনা ক'রে যে শাস্তি ইচ্ছা হয়, আমায় দিও; আমি হাস্যমুখে তা গ্রহণ ক'র্ব্বো।

ধীরেন্দ্র। শাস্তি দিই আর না দিই, সে সব পত্র পড়িলে হয়তো অনেক অজানা কথা ও ভাব বুঝিতে পারিব। এক্ষণে চল, ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস—পূর্ব্বকথা আলাপনে।

বাড়ী ফিরিয়া রামানন্দ বাবু উপরের বসিবার ঘর ঝাড়িতে ও বাতি দিতে আদেশ করিলে প্রাচীন ভৃত্য গোপালের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যেন মনিবের ভাষা ঠিক বুঝে নাই এমনি ভাবে সে উভয়ের মুখের দিকে চকিতনেত্রে চাহিতে লাগিল। তাহাঁকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া বন্ধুদ্বয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নীচজাতীয় কোনো কোনো প্রাণী গৃহটী ও তত্রাধিষ্ঠিত জিনিষগুলি আপনাদের নিজস্ব ভাবিয়া উত্তমরূপ ভোগদখল করিতেছে। তাহাদের কোনো বাধা দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যসূত্রে দিতে হইল।

উপবেশন করিয়া দুই বন্ধুতে প্রথমে নানা বিষয়িণী কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে নিরুপমার কথা উঠিল, আর অমনি যেন পূর্ব্বভাব সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। উদ্যানের কথাবার্ত্তা স্মরণ করিয়া রামানন্দ রায় নিজের বাক্স হইতে যত্নরক্ষিত, সুন্দর-হস্ত-লিখিত, একতাড়া পত্র বাহির করিলেন এবং বাছিয়া তাহার একখানা বন্ধুর হস্তে দিলেন। ধীরেন্দ্র বাবু পাঠ করিলেন—

"আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! কা'ল্ রাত্রে তুমি যাবার পর এখানে ভারি ঝড় বৃষ্টি হ'য়েছিল! কি ভয়ানক অন্ধকার, ঝড়ের হুহু শব্দ, আকাশের কড়্কড়্ হুড়্হুড়্ বজ্রধ্বনি—উঃ! মনে করিলে এখনো প্রাণটা শিহরিয়া উঠে! আমি সমস্ত রাত্রি একবারও চোকের পাতা বুজি নাই। কেবল মা জগদম্বার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দু-হাত

জুড়ে এক-মনে এক-প্রাণে তাঁকে ডেকেছি—তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক, মা যেন তোমায় নিরাপদে রাখেন, যেন একটা বৃষ্টির ফোঁটাও তোমার গায়ে না লাগে! হায় আমি কি অভাগিনী! আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল তুমি, এই ভয়ানক দুর্য্যোগের সময় পথের মাঝ খানে—হয়তো কোনো গাছতলায় কি কারোর ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে, আর আমি কিনা রাজ-রাণীর মতন দোতালা-ঘরের উপরে দিব্য খাট পালঙ্কে শুয়ে! ধিক্ নারীজীবনে! আমি পথের ভিখারিণী ছিলাম সে যে আমার পক্ষে বেশ ছিল! কেন তুমি আমাকে এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে আনিলে? আনিলে তো, এমন দুর্দ্দিনে অসময়ে কেন ফেলে গেলে? যেই এক একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হয়, আর অমনি দৌড়ে তেতালার ছাদের আলিসার ধারে গিয়ে রাজপথের দিকে চেয়ে দেখি—যতদূর চক্ষুর দৃষ্টি যায়, তোমায় দেখা যায় কিনা! বৃথা আশা! মিথ্যা চেষ্টা! যেই কড়্‌কড়্ শব্দে একটা বজ্রাঘাত হয়, আর ভয়ে প্রাণটা ছাঁৎ ক'রে উঠে—মনে হয় হয়তো পথের মাঝখানে এটা তোমার মাথায় —দূর হ পাপ চিন্তা! ঈশ্বর, ঐ সঙ্গে এ পাপ-চিন্তানলের মাঝখানে আমার হতভাগা মনটা ঐ বজ্রানলে কেন পুড়ে গেল না! তা হ'লে তো কোনো জ্বালা যন্ত্রণা থাকৃতো না,—

পালামত কা'ল্ বিমলা এই ঘরে আমার কাছে শুয়েছিল। আমায় অধীরা দেখে কত বুঝালে, এদিক্ ওদিক্ ক'র্ত্তে কত বারণ

ক'ল্লে'। লোক নিন্দার ভয় দেখালে—কিসের নিন্দা! জগতের সব এক দিকে, আর তুমি যে তুলাদণ্ডের আর এক দিকে, এটা হায়, ছেলে মানুষের মতন সে বুঝ্তে পাল্লে' না! আমি যে তোমার কাছে যাবার জন্য কত পাগলিনী, তা তোমায় কি ক'রে বুঝাব! কাছে থাক্‌লে আঁচল দিয়ে তোমায় ঢেকে রাখ্‌তুম; বৃষ্টির জলে ভিজে গেলে তোমার আদরের—আমার মাথার—এই লম্বা চুল দিয়ে তোমার গা হাত পা মুছিয়ে দিতুম! বিদেশে—জনহীন প্রান্তরে—পথের মাঝে—এ সব কে ক'র্বে? হায়, পুরুষের প্রাণ যদি নারীর প্রাণের মতন, কি তার শতাংশের একাংশও হ'তো, তা হ'লে কি তুমি সব ছেড়ে—আমায় ফেলে—কা'ল্ এমন দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে বাড়ী থেকে যেতে পা'র্ত্তে? না হয়, একটা শুভ যাত্রাই ভঙ্গ হ'তো —আর কি অন্য ভাল দিন পাঁজিতে ছিল না? আর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাছাই ভাল দিনে যাত্রা করার ফলতো এই হাতে হাতে! হা'স্‌বো কি কাঁদ্‌বো ভেবে পাইনে।

শেষরাত্রে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত সব থেমে গেলে সকালবেলা একজন সওয়ারকে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'র্ত্তে ব'লে তোমায় এই পত্র লিখ্‌তেছি। যতক্ষণ এ লোক না ফিরবে, সত্যি ব'ল্‌ছি, আমি স্নানাহার ক'র্ব্বো না। আ'জ্ যদি এ লোক না আসে, কা'ল্ আর একজন যাবে। তাতেও যদি জবাব না পাই, তা হ'লে—কিন্তু কি যে ক'র্ব্বো, তাতো লিখ্‌তে পারিনে এখন।

ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট পেয়ে যদি তোমার কোনো অসুখ হয়, আমার মাথা খাও, অবশ্য অবশ্য ভাল কবিরাজ দেখাবে। বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে সর্দ্দি হয়, সর্দ্দি হ'লে জ্বর হয়, জ্বর থেকে সকল রকম ব্যারাম টেনে আনে জানতো—না মা, আর ভাব্‌তে পারিনে। যদি দরকার হয় (না হয় যেন) বাড়ীর কারুকে পাঠাতে লেখ, তাও হবে। আমার যাবার যে কত ইচ্ছা তা কি ব'ল্‌বো—এ পোড়া কপালে হায়, তা কি ঘ'ট্‌বে!

উঃ! কি ক'রে কা'ল্‌কের রাত্‌ কেটেছে! আ'জ্‌ যতক্ষণ না খবর আস্‌বে, কি ক'রে দিন কাটাব! হে ভগবান, তুমি অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়! এ বিপদে দাসীকে ছেড়ো না। নাথ, তিনি তোমার মঙ্গল করুন। জানই তো এ বিপদে তিনিই একমাত্র আশা ভরসা। যেন তোমার হাতের লেখা দু-এক ছত্র নিয়েই এই পত্র-বাহক বা অন্য কেউ খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে—এমন ব্যবস্থা ক'রো। মঙ্গলা ঝি পত্র নিতে এসেছে, আর লেখার সময় নেই—রাগ ক'রোনা—

হতভাগিনী নিরুপমা।

পত্র পাঠ শেষ হইলে ধীরেন্দ্র নির্ব্বাক্‌ নিস্পন্দভাবে গালে হাত দিয়া কতক্ষণ রহিলেন। অন্ধকার-মেঘাবৃত রাত্রে বিদ্যুচ্ছটা বিকাশ হওয়ার মতন মলিন মুখে একটু হাসি হাসিয়া রামানন্দ

বলিলেন, "কি ভাবিতেছ ভাই? প্রথম-লিখিত এই একখানা পত্র পড়িয়াই তোমার এই ভাব; না জানি সব কয়খানা পড়িলে কি বুঝিবে—কি ভাবিবে! যাহা হউক, আমি তাড়াতাড়িতে এই পত্রের যে উত্তর লিখেছিলুম, সেখানা, কিরূপে জানিনা, ইহার সঙ্গে গাঁথা আছে দেখিতেছি, অন্য কোনোখানার জবাব কিন্তু নেই। তা না থাক্, নিরুপমার লিখিত যে কোনো পত্র পড়িলে আমার পত্রের মর্ম্ম অনায়াসে তোমার উপলব্ধি হইবে। যে যে ঘটনা বুঝিতে না পারিবে, জিজ্ঞাসা করিলে বুঝাইয়া দিব।" এই বলিয়া রামানন্দ নিজের লিখিত উত্তর, পরে ক্রমে ক্রমে নিরুপমার লিখিত কয়খানা পত্র, দেখাইলেন।

রামানন্দের পত্র।

আমার আদরের ভিখারিণি!

আমি শারীরিক ভাল আছি, কা'ল্ রাত্রে কোনো রকম ক্লেশ কি অসুবিধা হয় নাই। তোমার পত্র পাইয়া মনে অসীম কষ্ট পাইলাম। কষ্ট এইজন্য যে, আমার কথা ভাবিয়া তুমি অকারণে অত ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ এবং এখনো করিতেছ। একেতো তোমায় জীবনাধিকে ভালবাসি। তাতে, তোমার লিখিত পত্র পাঠে তোমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া, এই কষ্ট পাওয়া জন্য—আমার মনে যে কি অতুল আনন্দ হইতেছে, তা আর কি জানাবো। হয়তো তুমি মনে

করিবে তোমার কষ্টে আমার আনন্দ, এ কি রকম? আনন্দ এই কারণে যে, মাতৃ-পিতৃ-বন্ধু-বান্ধব-হীন এই হতভাগার কথা ভাবিবার জন্য একজনও এ জগতে আছে। উঃ, তোমায় যে কত ভালবাসি তা কি ক'রে জানাব। দেখ, আমাদের এই প্রথম বিচ্ছেদে একরাত্রি গত না হ'তে হ'তে এত যন্ত্রণা; না জানি, দীর্ঘকাল গত হ'লে কত কষ্ট হবে! কিন্তু নিরুপমে, জানিও, গ্রীষ্মের পরই বৃষ্টি ভাল লাগে, বর্ষাকালে তেমনটা নয়। প্রেম আর মিলন সম্বন্ধেও বিধাতার বুঝি ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা। পরিবারস্থ এত আত্মীয় স্বজন সত্ত্বেও তুমি যে আমার কথা ভেবে ব্যাকুল-প্রাণে এই লোক পাঠায়েছ, এতে তোমায় সহস্র ধন্যবাদ!

বাড়ী থেকে বাহির হওয়ার আগে ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি যে, এমন দুর্য্যোগ হঠাৎ উপস্থিত হবে—পশ্চিম আকাশে ঘোর-কৃষ্ণ মেঘের উদয় বুঝি বাড়ীর ভিতরের কাহারো নজরে পড়ে নাই। ক্রোশ দুই যাবার পরই আগে ঝড়, পরে বজ্রাঘাত, শেষে করকাপাত সহ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বেগে ঘোড়া ছুটাইলাম। সঙ্গী দুজন রক্ষীও তাই করিল। খানিকদূর গিয়াই এক গ্রাম ও নিকটেই একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ী পাইয়া আশ্রয় লইলাম। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমাদের ভাল জানেন। খুব আদরে ও যত্নে কা'ল্ রাত্রে সেখানে ছিলাম। আ'জ্ মধ্যাহ্নে কাছারি না গেলে নয় বলিয়া প্রাতেই যাত্রা করিলাম, তাঁদের বিস্তর উপরোধ অনুরোধ

রক্ষা করিতে পারিলাম না। কি করি—উপায় নাই। ঘোড়ায় চড়িব ঠিক এমন সময় তোমার পত্র লইয়া সওয়ার এই পথে হাজির। তাই তাড়াতাড়ি এই জবাব দিতেছি। আশা করি, এই পত্র পেয়েই তোমার সকল উদ্বেগ দুর্ভাবনা দূর হইবে।

কাপড় জামা ভিজিয়া যাওয়া ছাড়া কা'ল্ রাত্রে আর কোনো কষ্টই হয় নাই। তোমার আশঙ্কা বৃথা—হাকিম কবিরাজ দেখাতে বা বাটীর কাহাকেও এখানে আনাতে হবে না। তা হ'লে, তুমিও পাগ্লি, আস্তে, এও আবার কথা! কিন্তু আবার লিখি, এই দুশ্চিন্তা জন্যও তোমায় ধন্যবাদ! এর জন্যে আবার রাগ ক'র্বো এ কথাও মনে উদয় হ'তেছে! আমি যে তোমায় কত ভালবাসি তা এ পত্রে কি জানাব! যদি কখনো দেখাবার—জানাবার—বুঝাবার—দিন আসে, তখন বুঝিতে পারিবে। এখন বিদায়—ঘোড়া আর দাঁড়ায় না—রৌদ্রও বেশী হইতেছে—যাই!

শুভাকাঙ্ক্ষী রামানন্দ।

নিরুপমার ২য় পত্র।

হে জীবনানন্দ!

তোমার পত্র পেলুম—উঃ কি আনন্দ! এই দেখ, যদি নারীহৃদয় বুঝ্তে পার, কি করে চোকের জলে এই পত্র ভেসে যাচ্ছে জেনে লও, চিহ্ন দেখে মিলিয়ে নাও! হায় আমি কি হতভাগিনী! কা'ল্

রাত্রে ভয়ে ভয়ে, চোকের জল ফেলেছি, আর আ'জ্ কিনা মনের আনন্দে আবার কাঁদ্‌ছি! পোড়া চোকের কি সময় অসময় জ্ঞান নেই! কিন্তু এতে চোকের বড় একটা দোষ নেই, মনই নিজের আনন্দ জানাবার জন্যে, কথা কৈতে না পেরে, জলরূপে চোখ দিয়ে বাহির হ'চ্ছে! নাথ, তুমি যে আমায় যথেষ্ট ভাল বাস, তা কি জানিনে—না বুঝিনে? যে দিন পথের কাঙ্গালিনী ভিখারিণীকে গ্রহণ ক'রে, নিজের দয়াগুণে অট্টালিকার উপর তুলেছ; তার জন্যে কত কথা, কত ঠাট্টা, কত গঞ্জনা স'য়েছ; স'য়েও পা দিয়ে আবার না ঠেলে ফেলে তাকে বিবাহ ক'রেছ; তার পরও তাকে মানুষ কর্ব্বার জন্যে কত যত্ন চেষ্টা ক'রেছ; ক'রেও কিন্তু কোনো ফল হয়নি, জেনে শুনে নিজগুণে তবু এখনো চরণে রেখেছ। সেই দিন হ'তেই কি তোমার মন জান্তে আমার বাকী আছে? বড় দুঃখের, ভারি লজ্জার, অত্যন্ত ঘৃণার কথা, যে, নিতান্ত অযোগ্য পাত্রীর জন্যে তোমার এত কষ্ট, এত যত্ন, এত চেষ্টা ক'র্ত্তে হ'য়েছে; কোনো কিছুরই সামান্য প্রতিদানও আমার কাছে পেলেনা কিন্তু!

কিন্তু এ দুঃখিনী কাঙ্গালিনী আর কি প্রতিদান দিবে? দিবার মতন তার আর কি ধন আছে? জীবন যৌবন মন প্রাণ সবই ঐ চরণে সমর্পণ ক'রে সে যে নিশ্চিন্ত আছে—এ কথা সত্য কি মিথ্যা, নিজের মনে মিলাইয়া দেখিয়া লও। কেননা, মন প্রাণ সবই তো তোমারি কাছে, দেহটা সুধু এখানে প'ড়ে আছে মাত্র! তবে

এইটী ক'রো—তোমার কাছে হাত জোড় ক'রে কেবল এই একমাত্র ভিক্ষা—গোড়ায় এত স্নেহ যত্ন আদর খাতির ক'রে শেষে যেন সামান্য কারণে পায়ে ঠেলোনা। তোমরা পুরুষ মানুষ, মনে ক'ল্লে সব ক'র্ত্তে পার! যখন যেখানে থাক, দয়া ক'রে এক একবার খবর নিও, নিজের খবরটা দিও। যেন জল-প্রার্থী চাতকিনীর মতন হা ক'রে বৃথা আশায় থাক্‌তে না হয়! হায়, এই আশায় থাকাটাও কি আনন্দ!

আনন্দ!—কি সুমিষ্ট কথা! বুঝি তোমার নামের অংশ ব'লে এই কথাটায় আমার মনে এত আনন্দের—উঃ! কি একটা অবক্তব্য অচিন্ত্যনীয় ভাবের—উদয় হয়! এক একবার আমার মনে হয় তোমার নামটা খুব পছন্দ-সই রাখা হয়নি। এজন্য কে যে দোষী তা জানিনা—জানার দরকারও নাই! কিন্তু তোমার নামে আগাগোড়া—কি যে একটা মিষ্টতা আছে, তা কেবল আমিই জানি, আর আমার অন্তর আত্মাই জানেন। তুমি কাছে থা'ক্‌লে এ সকল কথা—এত মনের ভাব—তোমায় মুখে জানাতে কখনো পার্ত্তুম না। কেননা, পোড়া নারী জা'তের লজ্জাই সম্বল, আবার সকল কাজের প্রতিবন্ধকও যে এই লজ্জা! এই জন্য এক একবার মনে হয়—চিঠি লেখার সময় বুঝি তোমার বিদেশে থাকা বরং ভাল। কিন্তু না—না—আমি এ কি ক'র্‌ছি? কি ব'ল্‌ছি?—তুমি এ পাগলিনীর প্রলাপ শুনে আরও যেন বিদেশে থেকোনা—এসো! আমি হৃদয়

পেতে ডাক্‌ছি—ব'স্‌বে এসো। কিন্তু আ'জ্‌ আর বাড়াবাড়ি নয়—এখানেই থাকুক।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! মা জগদম্বা তোমায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাখুন। সহরে তোমার নানান্‌ কাজ, অনেক দেখাশুনা ক'র্ত্তে হয়, সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত থা'ক্‌তে হয়। আমার কথা সেখানে দিন রা'ত্‌ ভা'ব্‌বে, এমন আশা ক'র্ত্তে পারিনে! এক একবার—যখন সাবকাশ পাবে—নিদেন রাত্রে—এ জনম-দুখিনীর কথাটা মনে ক'রো, তা হ'লেই এ জীবনটা সার্থক হবে! এই সামান্য লেখনীটা আমার মনের ভাব—প্রেমের গভীরতা—জানাতে পাল্লে না হায়! এইটীই দুঃখ থা'ক্‌লো!

চরণাশ্রিতা দাসী

তোমার আদরের মলিনা।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস—প্রেমবর্ণনে।

রামানন্দের অনুরোধে ধীরেন্দ্র তাড়াসুদ্ধ সমস্ত পত্র কয়খানি উচ্চরবে পড়িতে লাগিলেন। যে যে স্থল দুর্ব্বোধ্য, বা যে যে ঘটনা বুঝাইবার যোগ্য মনে হইল, রামানন্দ রায় সাধ্যমত মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া সেই সেই স্থল বন্ধুকে উত্তমরূপে বুঝাইলেন। পড়িতে পড়িতে দুজনেই যে কত মুগ্ধ, স্তব্ধ, বিস্মিত হইয়া বারম্বার চক্ষুর জল মুছিলেন; সেই স্বল্পশিক্ষিত ক্ষুদ্র নারীহৃদয়ের অতুলনীয় অথচ গভীর প্রেম, ভক্তি, শিক্ষা, নম্রতা, ধর্ম্মজ্ঞান, আদর্শচরিত্রতা প্রভৃতি দেবভাব উপলব্ধ করিয়া যে কিরূপ আশ্চর্য্য হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। রামানন্দের কথায় ধীরেন্দ্র বেশ বুঝিলেন যে, যে সময়ে এই পত্রগুলি পান, সে সব সময়ে নানা কার্য্য-ব্যস্ততা মধ্যে এ গুলির পাঠ কালে রামানন্দ বাবু ইহাদের প্রকৃত মর্ম্ম ততটা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝি বা সে সময় বুঝিবার তত প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। কেননা সে সময়ে রামানন্দ রায়ের হৃদয়ের সমস্ত অংশটুকু নিরুপমাময় ছিল; সকল কাজেই তিনি যেন নিরুপমাকে সম্মুখে দেখিতেন; যেন কাণে না শুনিলেও নিরুপমার মিষ্ট কথাগুলি কাণে বাজিত; যেন অন্য কাকেও দেখিতে তিনি নিরুপমাকে সম্মুখে দেখিতেন। এইরূপ তন্ময়ত্বভাব হৃদয়ে থাকাতে তখন এ সকল পত্রের স্বরূপ মর্ম্মবোধ বুঝি বিশেষভাবে হয় নাই! পরে যখন মাধুরী সকল রকমে নিরুপমার স্থান অধিকার করিল, তখন কতক তার ভয়ে,

কতক খাতিরে, কতক অনাদরে এ সকল পত্র বাক্সের যে কোণে ছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল; সাবকাশ বা প্রবৃত্তি হইলেও তিনি একদিনও এ সকল উন্মোচিত করেন নাই। তার পর, মাধুরীর লীলাখেলা তথাবিধ অকথ্য কদর্য্য ভাবে সমাপ্ত হইলে যখন তুলনায় সমালোচনার সময় আসিল; যখন নিজ জীবনের আরম্ভ হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত সকল ঘটনা, সকল কথা, সকল কাজ ভাবিবার, বুঝিবার, বিচারের সময় উপস্থিত হইল; যখন লোক-নিন্দা, আত্ম-গ্লানি, নিজের জীবনে ধিক্কার, আপনার পরিণাম-চিন্তা তাঁহাকে কঠিন রোগ-শয্যায় শায়িত করিল, তখন—জীবনের মধ্যে সেই প্রথমবার—রামানন্দ রায় বুঝিতে পারিলেন প্রকৃত প্রেম কি দুর্লভ পদার্থ! তখন—সেই রোগশয্যায়—ঠিক বুঝি চিরদিনের মতন—শুইয়া পড়িয়া তিনি নিজের গত জীবনের সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন মনশ্চক্ষে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কালের তুলনা করিতে করিতে নিরুপমাকে যে দিন প্রথম দেখেন, দেখিয়াই অতুলনীয় প্রেম-পয়োধি-নীরে একেবারে নিমজ্জিত হন; সে দিনের নিজ মানসিক ভাব, এবং সে সময় মনে মনে যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল ভূত ঘটনা যখন এরূপ ভাবে ভাবিতে থাকিলেন, তখন কি আর তাঁহাতে তিনি ছিলেন? তখন যেন সমস্ত সৃষ্টি ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে; গত জীবনের সকল স্মৃতি যেন পূর্ব্ব-গত সৃষ্টি সহ

বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন; নবজীবন প্রাপ্তি সহ যেন সবই নূতন, যেন বিধাতার এক নব-সৃষ্ট নবলোকে তুজনে সমানীত; যেন তাঁরা তুজন ছাড়া আর কেউ সে জগতে বর্ত্তমান নাই! আরও কত কি ছাই ভস্ম, ভাল মন্দ, সুখ তুঃখ যে ভাবিলেন, দেখিলেন, বুঝিলেন তাহা কি লিখিব! কিন্তু আবার যখন চৈতন্যের উদয় হইল, তখন বুঝিলেন—সবই প্রেম-বিকার! কোথায় বা তাঁর সেই নিরুপমা, আর কোথায় একাকী রোগশয্যায় শায়িত তিনি! তিনি কি প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় অন্য সব ভুলিয়া, একমাত্র আশ্রিতা স্নেহ-লতাকে জন্মের মতন আশ্রয়বৃক্ষ-চ্যুত করেন নাই? তাহার শান্তি কি তাঁর এ জীবনে হইবে না? হইবে বৈ কি, এই যে হইতেছে—এইতো আরম্ভ, কোথায় কবে কিরূপে যে শেষ হইবে কে জানে?

হা ঈশ্বর! ইহারই নাম প্রেম! দয়াময়, এই তোমার সেই অকাট্য অচ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধন, যাতে সৃষ্ট জীবমাত্রেই আবদ্ধ থাকে? আর যা পাবার জন্য লোকে এত আকাঙ্ক্ষা, এত চেষ্টা, এত আকিঞ্চন করে! কিন্তু পেলেই, হায়, তোমার ভাগবতী মায়া-প্রভাবে বিন্দুমাত্রও সুখী হয় না—বুঝি বা সমস্তই ভুলিয়া যায়! প্রেমের স্রোত খুব অতল-স্পর্শ গভীর হইলেও এত পঙ্কিল কেন? শত—সহস্র—লক্ষ লোকের মধ্যে কয় জনের জীবনে নিষ্কণ্টক প্রেম উপভোগ করা ঘটে? প্রেমের জন্য লোকে এত পাগল ব'লেই কি এর পরিণাম সচরাচর এমন হয়? দীনবন্ধু, তুমি বৈ এর সত্বত্তর

কে দিবে জানি না। "প্রেম" কথাটী খুব ক্ষুদ্র, এতে দুটী মাত্র অক্ষর আছে বটে, কিন্তু ভাব যে অনন্ত, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক দেশে অনেক কবি অনেক কাল হইতে নানাভাবে প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন সত্য বটে। কিন্তু মানুষের সামান্য শক্তির সাধ্য কি, যে, তাহার স্বরূপ-বর্ণনা করিয়া উঠে?

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া বন্ধুদ্বয় সে দিনের মতন নিজ নিজ আবাসে গমন করিলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস—অবস্থা বর্ণনে।

পরদিন সংবাদ আসিল—দেশের তদানীন্তন নব ভূপতি ইংরেজ বাহাদুরকে নানারূপ যুক্তি আর সাময়িক সাহায্য দান করিবার জন্য রাজধানীতে যে মন্ত্রণা-সভা শীঘ্র বসিবে, তাহাতে জমিদার রামানন্দ রায়কে উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতে হইবে। "রাজধানী" বলিলে সে সময় কলিকাতাকেই বুঝাইত। যেহেতু, মুসলমান নবাবদের আমলের ঢাকা, গৌড়, মুরশিদাবাদ, মুঙ্গের প্রভৃতি কোনো নগরকেই ইংরাজেরা সে সময়ে কোনোরূপ প্রাধান্য দেন নাই। স্থানের উৎকর্ষতাতেই হউক, বাণিজ্যপোত সমূহের যাতায়াতের সুবিধা জন্যই হউক, বা অন্য যে কোনো কারণেই হউক, কলিকাতাই তখন তাঁহাদের একমাত্র প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। রামানন্দ বাবুর নামে এই নিমন্ত্রণের পত্র সম্ভবতঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের যুক্তি-কৌশলে আসিয়াছে—দুই বন্ধুতে এইরূপ মীমাংসাই করিলেন। কারণ, সকল দিক্ ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রামানন্দ রায়ের মতন মধ্যশ্রেণীর জমিদার তখন বঙ্গদেশে অনেক দেখা শুনা যাইত, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ মন্ত্রণাসভার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, নাটোরের বিখ্যাত রাণী ভবানী, বর্দ্ধমানের মহারাজ তিলকচন্দ্র, কলিকাতায় ইংরাজ-দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণ দেব এবং পূর্ব্বাঞ্চলের প্রসিদ্ধ বার-ভূঁইয়ার দু-একজন খ্যাতনামা ভূস্বামী ছাড়া

অন্য কাহারও নাম এই সভার তালিকাভুক্ত দেখা যায় নাই। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালার ভূস্বামী-বর্গের স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার জন্য এখনকার মত কোনো সভাসমিতি ছিল না। যখন রাজকার্য্য উপলক্ষে তাঁহারা সকলে বা অধিকাংশ মুর্শিদাবাদ নগরে আসিতেন, তখন সাবকাশকালে প্রায়ই স্বদলস্থ জগৎশেঠের ভবনে উদ্দেশ্য সাধন জন্য একত্র সংমিলিত হইতেন। সকলে এখানে মিলিলে ঘরসংসার ও দেশের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ বিচার জল্পনা কল্পনা হইত। ধনীশ্রেষ্ঠ পদগৌরবে মান্য জগৎশেঠ ও তাঁহার পুত্রাদি পরিজনবর্গ সে সময়ে সকলকে সাধ্যমত যত্ন খাতির করিতে তিলমাত্র ক্রটী করিতেন না। আবার, যে দিন কোনো কর্ম্ম উপলক্ষে সাধারণের নিমন্ত্রণ হইত, সে দিনও কোনো-না-কোনো নির্জ্জন গৃহে সম্মিলিত হইয়া যাহাতে এই সকল জমিদারবর্গ অবাধে নিজ নিজ মন্ত্রণা করিতে পারেন, তাহারও চেষ্টা হইতে ক্রটী ঘটিত না। ফলতঃ, জগৎশেঠের বৃহৎ প্রাসাদ তখনকার হিন্দু জমিদার-কুলের একমাত্র মন্ত্র-ভবন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই অভাব যাহাতে দূর হয়, সে চেষ্টা করার ইচ্ছা বরাবর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনের সংকল্প ছিল। এ গল্পের আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামানন্দকে আপন পুত্রাধিক স্নেহ যত্ন করিতেন। রামানন্দের নাম সম্ভ্রম খ্যাতি সম্পত্তি স্বতঃ পরতঃ বৃদ্ধি করিতে মহারাজ যেমন উদ্যোগী ও

চেষ্টিত ছিলেন, এমন সহায় তাঁহার আর দ্বিতীয় ছিল না। তা ছাড়া, আরো একটা বিশেষ কারণ এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। অর্থাৎ, পারিবারিক এই সকল অশান্তির পর, রামানন্দ নিজ অন্তঃপুর হইতে কোথাও যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাহির হইতেন না, এ কথা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অগোচর ছিল না। কিন্তু নানা কৌশলে তিনি রামানন্দকে নিজের রাজধানীতে একবেলার জন্যও লইয়া যাইতে পারেন নাই। ভয়, মৈত্রতা, প্রলোভন, বিনয়—এমন কি, "না আসিলে মহারাজ নিজে গিয়া রামানন্দকে দোষী আসামীর মতন ধরিয়া লইয়া আসিবেন" এমন ভাবের কথাও—রামানন্দ রায়কে নত করিতে পারে নাই। রামানন্দ তখন যেন মানব-জীবনের সমস্ত উপরোধ অনুরোধের হাত এড়াইয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে নগণ্য প্রজাশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া নিজের জীবনাংশ নষ্ট করিতেছিলেন। যে কোনো কৌশলে হউক, তাঁহাকে একবার ঘরের বাহির করিতে পারিলেই বুঝি মহারাজার অভীষ্ট সিদ্ধি হইত। দেশের নবভূপতির নামে লিখিত, সহিমোহর করা সরকারী নিমন্ত্রণের পত্র কখনো অবজ্ঞাত হইবে না ভাবিয়াই মহারাজ এই সুযোগ উপেক্ষা করেন নাই, এটা স্পষ্ট বুঝা গেল। মহারাজার প্রকৃতি প্রবৃত্তি রামানন্দ রায়ের খুব ভাল জানা ছিল।

বুঝিয়া কিন্তু দুই বন্ধুতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক কোনো রকমেই রামানন্দ রায়ের অবস্থা তখন

তেমন নয়, যাহাতে তিনি অতদূরে এককালে ভ্রমণ বা অবস্থান করিতে পারেন। তৎকালে কলিকাতা যাতায়াত পক্ষে নৌকাপথ ছাড়া অন্য সুগম উপায় কিছুই ছিল না বলিলে চলে। কোনোরূপ দুশ্চিকিৎস্য কঠিন রোগের পর নৌকাপথে ভ্রমণ এখনকার অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে সুন্দর সহজ ব্যবস্থা হইলেও তখনকার দেশী হাঁকিম কবিরাজেরা ইহার উপকারিতা ততটা মানিতেন না বা জানিতেন না। বরং নদ নদী, এমন কি, সমুদ্রের জলীয় বায়ু সেবন দূষিত বলিয়া সে সময়ের সকল লোকের মনে একটা দৃঢ় সংস্কার ছিল। তার পর মানসিক অবস্থার পক্ষে রামানন্দ বাবু তো এখনো কোনো রকম রাজকীয় বা সামাজিক কাজে মিশিবার উপযুক্ত হইতে পারেন নাই। অনেক দিনের পর বাটীর বাহির হওয়া এবং বন্ধু ধীরেন্দ্রের সঙ্গে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কওয়া কেবল কয়দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল মাত্র। আবার, সে সময়ে নবাধিকৃত দেশরক্ষা সম্বন্ধে সরকারী কিরূপ হুকুম কাহার্ উপর কখন্ পড়ে, তাহারও কিছুই স্থিরতা ছিল না। অর্থ সাহায্যে বা সৈন্য সামন্ত লাঠিয়াল দ্বারা শান্তিরক্ষা করার ভার তখনকার দিনে বাছা বাছা উপযুক্ত জমিদারের উপর ন্যস্ত হইত। তাহার উপকার অবশ্য কোম্পানী বাহাদুরের লভ্য ছিল। অতএব, অনেক আন্দোলনের পর এইরূপ ধার্য্য হইল যে, রামানন্দ বাবুর স্বহস্ত-লিখিত পত্র লইয়া ধীরেন বাবু শুভদিনে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিবেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি হইলে

তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ মহারাজার সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্তও যাইবেন। এই সময়ে আবার এরূপ প্রতিনিধি-গ্রহণ-প্রথা ইংরেজ-সরকারে বহু-প্রচলিত না থাকাতে এই রকম একটা ব্যবস্থা হইল যে, সমস্ত স্বরূপ অবস্থা জানিয়া শুনিয়া মহারাজ যদি নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তবেই ধীরেন্দ্রনাথের যাতায়াত, নচেৎ নয়।

এই সকল ও অন্যান্য বৈষয়িক বন্দোবস্তের পর একদা একটু সাবকাশ পাইয়া এবং উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন :—"বন্ধুবর, নিরুপমা সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের মধ্যে হইয়া গিয়াছে; কেবল একটি বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল আমি কিছুতেই নিবারণ—"

রামা। যা জানার ইচ্ছা থাকে স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর। এখন কেবল গত বিষয়ের আলোচনা বৈ আমার চিত্তবিনোদনের সামান্য-মত উপায়ও আর নাই।

ধীরেন্দ্র। তোমাদের বিবাহ বাসরের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব শেষ হইবার রাত্রে পতি-পত্নীর বিবাদ বিচ্ছেদ হয়। একটা সামান্য ছল ধরিয়া তুমি সেই রাত্রেই কৃষ্ণনগর চলিয়া যাও। তার পর কয় মাস বাড়ী ফিরিয়া আইস নাই; নিরুপমা দেবীর নিরুদ্দেশের পর একেবারে দ্বিতীয় পত্নী সহ আনন্দপুরে ফিরিয়াছিলে। তা, জিজ্ঞাসা করি, এ সময়ের মধ্যে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো পত্র লেখালেখি হয় নাই কি?

রামা। কিছু না। পত্র লিখিবে কে ভেবে বল দেখি শুনি? আমার মনের ভাব তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম। অকারণ ক্রোধ, হিংসা চরিতার্থ-প্রবৃত্তি, নিরুপমাকে বিশেষরকম শাস্তি দিবার ইচ্ছা আর চেষ্টা, প্রভৃতি ভাব তখন আমাকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ঘটিয়াছিল, প্রকৃত প্রেম-সঞ্চার কিছুতেই নয়। অবশ্য, এর উপর স্বার্থান্বেষণকারী দলের উত্তেজনা যে যথেষ্ট ছিল, তা তুমি বেশ জান। তার পর যখন দেখিলাম—অন্য বারের মতন এবারে নিরুপমা কোনো রকম ভাবিত হইয়া পত্র বা সংবাদ দিল না, সুতরাং সে একটুও নত হয় নাই, তখন—

ধীরেন্দ্র। (মৃদুহাস্যে) তুমি যে ভাই, ঠিক বিপরীত কথা ব'ল্‌ছো দেখ্‌ছি। যে কাজ তোমার করা উচিত ছিল, পরিত্যক্তা পত্নী হ'য়ে তিনি কি ক'রে তা করেন? পতিব্রতাই হউক বা যে রকম অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, স্ত্রীলোক কি সহজে নিজ স্বভাব-সিদ্ধ অভিমান ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে? তুমি কি ঐশ্বরিক নিয়ম ব্যবস্থা উল্টাইতে চাও নাকি?

রামা। তা সত্য। কিন্তু এসব বুঝিবার ক্ষমতা তখন আমার কোথায়? আমি যে তখন ক্ষণিক উন্মত্ততা-প্রসূত প্রচণ্ড রাগেই ক্ষিপ্ত। হ'য়ে কিন্তু এই ক'র্ল্লুম যে, সহর থেকে একখানা নরম গরম

গোছের পত্র নিরুপমাকে লিখ্‌লুম। সে পত্র তোমার নামের পত্রের সঙ্গে সওয়ারের হাত দিয়ে পাঠাই। মনে পড়ে কি ?

ধীরেন্দ্র। (স্মরণ করিয়া) হাঁ্যা, হাঁ্যা, এখন ভাই, সেটা মনে প'ড়েছে। সেই পত্র যে দিন বৈকালে আসে, তার পর দিন থেকে আর নিরুপমা দেবীকে আনন্দপুরের বাড়ীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নাই। অনুমান হয়, তোমার ঐ পত্রে কোনো কড়ারকম কিছু লেখা ছিল। সুতরাং মনের বিরাগে বা অন্য কোনো কারণে তিনি কোথায় চ'লে যান। কি হয়তো বা কোনো রকমে আত্মহত্যা ক'রে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রেছেন। সাধারণ লোকে তৎসম্বন্ধে যা খুসী বলে বলুক, আমরা কিন্তু এই বুঝি যে, অমন আদর্শ-চরিতা দেবী-প্রতিমা কখনো কি কুলে কালি দিতে পারে—

রামা। (সাক্ষেপে) ভাই হে, সেও তো আমার পক্ষে ছিল ভাল। যেখানে যে অবস্থায় থাকুক, নিরুপমা বেঁচে আছে এটা জান্‌তে পা'ল্লে'ও তবু মনে অনেকটা সুখ স্বস্তি হয়, বুঝি বা কতক শান্তিলাভ ক'র্ত্তেও পারি। ঐ যে ব'ল্‌ছিলুম, তখন আমি অন্য রকমে মত্ত না হ'লে, ভাল ক'রে খোঁজ খবর নিতে পা'ল্লে, কি কোনো রকম পুরস্কার দেবার আশা দিয়ে লোকজন নিযুক্ত ক'ল্লে, বুঝি বা সত্য কথা জানা যেতো। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু তুমি যা আশঙ্কা ক'চ্ছো, বোধ হয় যেন সেইটাই ঠিক। নিরুপমা নিশ্চিতই বেঁচে নাই। থা'ক্‌লে কি সব ছেড়ে এতদিন চুপ ক'রে সে কোথায়

থা'কতে পা'র্ত্তো? সত্যই কি অত গভীর প্রেম দু-চার কথায় শুকাইয়া গেল? মানুষের, আর কিছু হোক্ না হোক্, খাওয়া পরাও তো আছে?

ধীরেন্দ্র। তুমি যে স্বেচ্ছাকৃত দানপত্র যোগে তাঁর নামের বিষয় আশয় সব তাঁকে ইচ্ছামত ভোগদখল কর্ব্বার ভার দিয়েছ তখন ব'ল্‌ছিলে, সেটা হয়তো তাঁর জানা ছিল না—

রামা। (চিন্তা করিয়া) ছিল বৈ কি। ঐ যে পত্রখানার কথা ব'ল্‌ছিলুম, ওতে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা আর টাকাকড়ি, গহনাপত্র, জমিদারীর আয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা, সবই তো চুল চিরে লেখা ছিল। বাড়ার ভাগ, নিজের মনের উদারতা দেখাবার জন্যে একখানা "ছাড়-পত্র" স্বাক্ষর ক'রে নিজের নামের সহি মোহর দিয়ে ঐ সঙ্গে দিয়েছিলুম—

ধীরেন্দ্র। তা ভালই ক'রেছ। কিন্তু পুনরায় বিবাহ করার প্রস্তাবে নিরুপমার কাছ থেকে প্রতিবাদ বা আর কোনো রকম জবাব পেয়েছিলে কি শুনি?

রামা। কিছু না। সে পত্রের উত্তর দিবার প্রয়োজনও বুঝি বা ছিলনা। কেননা,—হায় কুপরামর্শ!—সে পত্রখানা এমনভাবে লেখা ছিল যে, যেন ইচ্ছা থাক্‌লেও নিরুপমা কোনো রকম জবাব না দেয় বা প্রতিবাদ না করে—

ধীরেন্দ্র। তার পর দেবীর ভবনত্যাগের পর যখন তুমি সস্ত্রীক বাড়ী ফিরে এলে, সে সময়ে সখীদের কাছে, কি বাক্স সিন্ধুকের মধ্যে, তাঁর কোনো পত্রাদি পাওনি ?

রামা। (চিন্তা করিয়া) কৈ, না। আবার সে সময়ে এমনতর পত্রাদি সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান যে দরকার সেটা আদৌ মনেই করি নাই। তখন নিষ্কণ্টক পুরী—আপদ বিদায়—দেখেই আমরা যে আনন্দে ঘোর উন্মত্ত! (দীর্ঘ নিশ্বাস) তখন কি আর ও সব খোঁজ খবর ভাল লাগে ; না, সে কথা মনে স্থান পায় ? নিরুপমার নিজের বাক্সে বা অন্যত্র কিছু থাকা সম্ভব ছিল কিনা তাও জানিনে। তবে, একপাশে-পড়ে-থাকা চুল বাঁধ্‌বার বড় আর্সির টানা-বাক্সের তলায় দৈবাৎ একদিন একখানা কাগজ পাই। তাতে পেন্সিলে-লেখা একটা খেদের গান। হাতের লেখা দেখে বোধ হয়, সেটা নিরুর রচিত। অন্য কারোর মুখে এ গানটা কখনো শুনেছি ব'লে কৈ মনে তো হয় না—

ধীরেন্দ্র। কৈ সে গান—আছে, না ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছ ?

রামা। না, না, নষ্ট ক'র্ব্বো কেন, সেটা আছে বৈ কি। যদি দেখ্‌তে চাও, এখুনি দেখাতে পারি। তখন ততটা গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু পরে খুঁজে বা'র্ ক'রে ইষ্ট-কবজের মতন্ সযত্নে অন্য পত্রের সঙ্গে সেখানাও গেঁথে রেখেছি। জানই তো, আমার পক্ষে এখন এই সকল প্রেম-চিহ্ন চিত্তবিনোদনের কেবলমাত্র উপায়।

এই বলিয়া বাক্স হইতে সেই ভাঁজ করা কাগজখানি বাহির করিয়া রামানন্দ বন্ধুর হাতে দিলে ধীরেন্দ্র আস্তে ব্যস্তে পাঠ করিলেন ঃ—

নারী-হৃদে যত প্রেম পুরুষে কি তত হয় ?
তা হ'লে সংসারে, সখি, হ'তো কত সুখোদয়।
পুরুষ রূপেতে মজে, নারী রূপে গুণে ভজে,
দ্বিগুণ বন্ধনে বাঁধা নারী-মন শক্ত রয় !
দেখিলে সুন্দরী নারী, পুরুষ চঞ্চল ভারী,
এক-প্রেমে ম'জে নারী করে, সখি, জন্ম-ক্ষয় !
বয়সে করমে দোষ, ভাবি, নাহি করে রোষ,
যাহাতে মনের তোষ, তারি প্রতি সুখী হয় !
এমন ত্যাগ-স্বীকার, জগতে কে পারে আর,
পুরুষ নারীতে ভেদ,—নারী শুধু প্রেম-ময় !

ধীরেন্দ্র। বাহবা, বাহবা, খুব ঠিক ! আহা, দেবী যথার্থই মানব-হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা ক'রেছেন্। কে বলে, তোমার নিরুপমা ভাল লেখাপড়া জান্তেন না—বলতো শুনি ?

রামা। (সখেদে) আর কার্ দোষ দিব ভাই ? এই পাপিষ্ঠ নিজেই তাঁকে মূর্খ—স্বল্প-শিক্ষিত ব'লে নানারকমে অগ্রাহ্য ক'র্তো ! তাঁরে চির-পরিত্যাগের একরকম প্রধান কারণই বুঝি এই !

ধীরেন্দ্র। কিন্তু ভেবে দেখ, এগুলো কি সেই রকম লোকের মতন লেখা ? আমরা তো এত পাণ্ডিত্যাভিমানী, কৈ এ রকম

দু-একটা গান খামকা রচনা করি দেখি? উঃ! কি উচ্চ ধরণের ভাব! নিজের মনের অবস্থার সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের তুলনা খুব ঠিক প্রকাশ হ'য়েছে, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌তে প্রস্তুত আছি—কিন্তু এ আবার কি? এই যে কাগজের অপর পৃষ্ঠে আর একটা গান লেখা। এটা যে বিদায়-সঙ্গীত, অথচ তোমার উদ্দেশে রচিত, দেখ্‌তিছি। তুমি কি জাননা,—না, এটা আগে পড়নি? কৈ, এ গানের কথাতো একবারও বলনি—

রামা। কৈ দেখি? (পড়িয়া) না, নরাধম আমি আগে এ গান চর্ম্ম-চক্ষে কৈ দেখিনি। আমি ভাই চক্ষুর জলে আর প'ড়্‌তে পারিনে। এই নাও, তুমি পড়। আমি তন্ময় হ'য়ে শুনি—

বিদায় গীত

ফুরাইল লীলাখেলা এতদিন পরে!
চলিলাম সব ছাড়ি দেশ দেশান্তরে!
মনে ছিল বড় আশা, পাব তব ভালবাসা,
ভাগ্য-দোষে হ'লোনা তা (যেন) পাই জন্মান্তরে!
রূপে গুণে নাহি তুল, বিদ্যাধনে ধন্য কুল,
পাপিষ্ঠা পাইবে কিসে হেন শ্রেষ্ঠ নরে!
যেথা যাও যেথা রও, ধনী মানী গণ্য হও,
আশাপূর্ণ হোক তব, সুখে থাক ঘরে!
কেহ যেন আমাস্তিরে, তোমা নিন্দা নাহি করে,
যদি ভালবেসে থাক, ভুল তা অন্তরে!

পঞ্চম উচ্ছ্বাস—নিমন্ত্রণ গ্রহণে।

কিন্তু অল্প কয়দিনের মধ্যেই দেওয়ান ধীরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা হইতে এই বিশেষ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, সে সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ফরাসিদের সহিত একটা প্রধান নগরের অধিকার লইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত। এজন্য মন্ত্রি-সভা সহ তাঁৎকালিক প্রধান ইংরাজ-কার্য্যাধ্যক্ষ গবর্ণর বাহাদুর নানারূপে বিব্রত, সুতরাং যুদ্ধের সমাপ্তি পর্য্যন্ত রাজস্ব এবং শান্তি-রক্ষা সম্বন্ধে আহূত এই মন্ত্রণা-সভা দিনকতক স্থগিদ্ থাকিবে। এদিকে, পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের কয় জন প্রধান ভূম্যধিকারী এবং নাটোরের বিখ্যাত রাণী-ভবানী কৃষ্ণনগর রাজভবনে সমবেত হইয়াছেন। যেহেতু, এখান হইতে সকলে একত্র হইয়া নৌকাযোগে কলিকাতা যাইবেন, প্রথম হইতে এই ব্যবস্থা ও উদ্যোগ ছিল। কালিঘাট এবং অন্যান্য নিকটস্থ তীর্থাদি দর্শন তথা অদূরবর্ত্তী গ্রহণ উপলক্ষে সেখানে স্নানদানাদি হিন্দুর পুণ্যকর্ম্ম করাও অনেকের মানস। এজন্য সকলেই এ সংবাদে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ আবার কোন্ মুহূর্ত্তে কলিকাতা যাইবার নিমন্ত্রণ পত্র আসে, সেজন্য বাড়ী ফিরিতেও সাহস হইতেছে না। এদিকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

এমন একটা শুভযোগ ত্যাগ না করিয়া নানা আমোদ প্রমোদের উদ্যোগে এই সকল গণ্য মান্য অতিথিকে স্ব স্ব দলবল সহ নিজ ভবনে সযত্নে রাখিয়াছেন। নিজের স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তা-গুণে মহারাজ কাহাকেও ছাড়েন নাই। দেশ বিদেশের যত রকম ক্রীড়া কৌতুক, নাচ তামাসা, বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা এই অল্প সময় মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহার কিছুরি ক্রটি হইতেছিল না।

আবার, সকলের চেয়ে বেশী বিস্ময়ের একটী ঘটনা এই যে, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামে বশিষ্ঠমুনির স্থাপিত বিখ্যাত তারাদেবীর মন্দিরের সন্নিকটে নদীতীরস্থ বৃহৎ বটবৃক্ষতলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া যে বৃদ্ধ যোগী বহুকাল বসবাস করিতেছিলেন, নৌকাযোগে ভ্রমণ মানসে তিনি সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান ও লীলাভূমি নবদ্বীপের সপ্তম দর্শনীয় ভাগ তথা শান্তিপুর, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি নিকটস্থ অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সকল দর্শনই নাকি তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার বহুদিনাবধি বিশেষ পরিচয় ছিল। লোকমুখে যোগীর আগমন-সংবাদ পাইয়া, কয়েক দিন হইল, মহারাজ তাঁহাকে নিজ নগরে আনাইয়া বিশেষ যত্নে রাখিয়াছেন। এই যোগী বহুবিধ অলৌকিক কর্ম্মপটু, কঠিন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আরোগ্যক্ষম, আবার (চুপে চুপে) যাঁর উপর এঁর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি হয়, যোগবলে তাঁর ইষ্টদেবতাকে নাকি ইনি প্রত্যক্ষ দেখাইতেও পারেন! এজন্য,

শত শত নানাবিধ লোকে তাঁহাকে প্রত্যহ ঘিরিয়া নিজ নিজ ঈপ্সিত কার্য্য সকল করিয়া লইতেছে।

এই যোগী অবিবাহিত, চিরকাল এই প্রবাদ থাকিলেও একটি মধ্যবয়ঃস্থা স্ত্রীলোক ও তাহার একটী কিশোর-বয়স্ক পুত্র এবার ইঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। এই রমণীর বয়স রূপ গুণ কিরূপ, তাহা কেহ জানে না। কেননা, তিনি কাহারো সঙ্গে দেখা করেন না বা কোনো কথা কন না। এমন কি, বিশিষ্ট ঘরের স্ত্রীলোকেরাও এ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ দেখিতে পান নাই। নৌকার উপরিস্থ একটী পার্শ্বের ঘরে একরকম অবরুদ্ধ অবস্থায় তিনি বাস করিতেন। ইঁহার পুত্র সকল কাজে যোগীর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ। বালকটী পরম সুন্দর, যে-সে-ঘরে তেমন কোমল-কায় অথচ কান্তিপুষ্ট, সবল-দেহ, হাস্যমুখ, সদানন্দ-চিত্ত, বুদ্ধিমান কুমার সচরাচর দেখা যায় না। সে নিশ্চয়ই কোনো রাজপুত্র বা বড় ঘরের ছেলে; দেখিলে হঠাৎ শাপভ্রষ্ট দেবকুমার বলিয়া মনে ভ্রম জন্মে। আবার এই অল্প বয়সেই সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। বিধাতা যেন একাধারেই রূপ ও গুণের একত্র সংমিলন দেখার আশয়ে এই বালকটী সৃষ্টি করিয়াছেন এমনি অনুমিত হয়। রাষ্ট্র হইল, যে, একটা ভাল দিন নির্দ্ধারণ করিয়া কৃষ্ণনগরে শীঘ্র একটী সভা আহূত হইবে; যেখানে সেই বালক সকলের সমক্ষে আপন বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় দিবে। তাই মহারাজের বিশেষ অনুরোধে ধীরেন্দ্র রামানন্দ

বাবুকে লইতে আসিয়াছেন। রামানন্দ বাবু এ সময় না গেলে মহারাজা এবং অন্য সকলেই যে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইবেন স্থধু তা নয়; আমোদ প্রমোদের সারাংশ কেহ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, সকলেরি এমনি ধারণা ইত্যাদি ইত্যাদি।

চুম্বকপ্রস্তর বহুদূরে থাকিয়াও যেমন যৌগিক আকর্ষণ-বলে অনায়াসে লৌহকে নিজের সমীপবর্ত্তী করে, ঐশ্বরিক কোনো অজানিত ক্ষমতা-বলে রামানন্দ রায় সেইমত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভবনে এই স্থযোগে উপস্থিত হইবার জন্য আকৃষ্ট হইলেন। বহুকাল একই স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার কেমন যেন একটা মানসিক অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল। নিজ ভবন হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি দ্বিগুণ শারীরিক বল ও মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিবেন প্রায়ই এইরূপ কথা ভাবিতেন। এজন্য, এমন স্থযোগ ত্যাগ না করিয়া ভ্রমণোপযোগী যথোচিত পরিচর বৃন্দ ও বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ সহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। অত্যন্ত যত্ন ও আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমবেত অতিথিগণের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের পরিচয় করিয়া দিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অগ্রেই জানিতেন; শীর্ণ শরীর দর্শনে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই এই মাত্র। তাঁহার কৃষ্ণনগরে বাসের জন্য পূর্ব্বমত সকল স্থবন্দোবস্ত হইতে কোনো ক্রটীএবারও হইল না।

বহুদিন পরে, রামানন্দ রায়কে কৌশলে নিজ নগরে আনিয়া স্থধু

বাসা দিয়াই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু নিশ্চিন্ত হইলেন না। মানসিক ক্লেশ ও অশান্তি তাঁহার সকল রোগের মূল জানিয়া, নিজসভায় নিযুক্ত হুগলিজেলা-অন্তর্গত সুগন্ধ্যা-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক প্রবর গোবিন্দরাম রায়কে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেরূপে যত শীঘ্র পারেন রামানন্দকে যেন রোগমুক্ত করেন। নিদানজ্ঞ ভিষক্‌বর তদনুসারে অন্য নানা ব্যবস্থার পর এই একটী বন্দোবস্ত করিলেন যে, আনন্দপুরের জমিদার প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে পদব্রজে ২।৩ ক্রোশ ভ্রমণ এবং অপরাহ্নে নৌকাযোগে নিজে দাঁড় বাহিয়া অন্ততঃ দুইঘণ্টাকাল জলবিহার করিবেন। কিন্তু অনেক দিনের পরে শীর্ণ শরীরে সহ্য হইবে কিনা, এই সন্দেহে পূর্ব্বাভ্যস্ত ব্যায়াম-ক্রীড়ায় পুনঃ মনোনিবেশ করিতে বলার সাহস হইল না। নানা অনুরোধে এবং অকাট্য প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া, কতক অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রামানন্দকে এই দুইটী মুষ্টিযোগ অবলম্বন করিতে হইল। মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ বৈকালিক ভ্রমণ সময়ে, মহারাজা নিজে বা তাঁহার একজন পুত্র অথবা আমন্ত্রিত ভূস্বামিগণের কেহ-না-কেহ পালামত এই ক্রীড়ামোদে যোগদান করিতেন। সমবয়স্কেরা একত্র হইলে নৌকাতেই নানারূপ আমোদ প্রমোদ, রং তামাসা, আহার বিহার চলিত। যেদিন মহারাজার নিজের নৌকায় কেহ দাঁড়ি, কেহ মাঝি, কেহবা অন্য কাজে নিযুক্ত হইতেন, সেদিন মনের আনন্দে অনেকদূর বাহিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইয়াও যাইত।

এইরূপ একদিন বহুদূর গমনের পর প্রত্যাগমন সময়ে নগরের ক্রোশার্দ্ধ দক্ষিণে তীরসন্নিহিত এক বটবৃক্ষতলে সুন্দর একখানি বজরা-নৌকার মধ্য হইতে মধুর সেতারবাদ্যসহ বেহাগ রাগিণীতে গীত নিম্ন-লিখিত গানটী শুনিতে পাইয়া বিমুগ্ধ রামানন্দ ক্ষেপণী ক্ষেপণে ক্ষান্ত হইলেন। বসন্তকালের শুক্ল অষ্টমীর রাত্রি। প্রস্ফুট চন্দ্রিকার বিমল জ্যোতিতে চারিদিক্ সমুজ্জ্বল; কোনোদিকে বেশী শব্দ বা নদীবক্ষে সামান্য তরঙ্গমাত্রও নাই। কিন্তু তাঁহাদের নৌকা অপর নৌকার নিকটবর্ত্তী হইলেও সেটী কাহার্ নৌকা বা কে তন্মধ্যে গান করিতেছেন, প্রত্যাগত নৌকারোহীরা বহু চেষ্টাতে সেটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কেহ কিছু বলিতেও পারিল না। তবে গানটী নারীকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া বেশ বোধ হইল। বন্ধু ধীরেন্দ্র-নাথের ইঙ্গিতে, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত, নিশ্চল ভাবে উৎকণ্ঠ হইয়া রামানন্দ রায় শুনিলেন :—

কাজ কি ক্রন্দনে, সখি, কাঁদাতো বিফল।
মুছে ফেলি—দূর হোক—এই অশ্রুজল।
যেন এই অশ্রু দেখি, বুঝিতে না পারে, সখি,
অন্তরের যাতনায় হতেছি বিকল। ১।
ফিরে পুন দেখা হ'লে, এই হাসি যেন বলে,
বিচ্ছেদ হয়নি ভেবে আছিলো নিশ্চল। ২।
যে মুখ দেখে দর্পণে, দর্প বড় হ'তো মনে,
ভ্রান্তিদূর সনে তারে ভাঙ্গি—করি ছল! ৩।

বুঝিতে পারিবে কি, সে, তার প্রেমে মজি শেষে,
মন প্রাণ মান আমি হারান্থ সকল। ৪।
জীবন যৌবন ধন, সব তার শ্রীচরণ,
সে যদি ভাবিত (সই) হ'তো কত শুভ ফল ! ৫।
মিলনের নাহি আশা, মিটেছে ক্ষুধা পিপাসা,
তবু কেন কাঁদে প্রাণ হ'য়েরে পাগল ! ৬।

ঝড়বৃষ্টির সময়ে দূরবর্ত্তী বজ্রধ্বনি যেমন প্রথমে বহুশ্রুত হইয়া ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসে, প্রতিকূল-পথগামী নৌকা হইতে আগত সঙ্গীতধ্বনি সেইরূপ স্পষ্ট ও স্বল্পশ্রুত হইয়া এককালে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন, সঙ্গীতমুগ্ধ ধীরেন্দ্র বন্ধুর দিকে চাহিয়া দেখেন—তিনি অচেতন। নিদ্রাভিভূত ভাবিয়া প্রথমে কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই; পরে যখন মোহপ্রাপ্ত বলিয়াই ঠিক উপলব্ধি হইল, তখন বিস্তর শুশ্রূষা এবং যত্নে চেতনা পুনরানীত হইল। কিন্তু সে সময়ে ও পরে বহু চেষ্টায় এবং জিজ্ঞাসায় কেহই স্বরূপ কারণ জানিতে পারিল না। অতিরিক্ত শ্রমজনিত দুর্ব্বলতা কারণ নিশ্চিত করিয়া অন্য সকলেই সন্তুষ্ট হইল। বাটী ফিরিয়া আসিয়া নির্জ্জনে ধীরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন যে, সঙ্গীতের মধুর ভাব শ্রবণে বন্ধুর মনের গতিক ওরূপ হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে রামানন্দ রায় কয় দিন এত দুর্ব্বল ও অন্যমনা রহিলেন, যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বাটীর বাহিরে গমনশক্তি একেবারে ছিল না; চিকিৎসকের নিষেধ মতে, বহির্গমন

এবং ভৃত্যমুখে সংবাদ দান ভিন্ন যাহার-তাহার-সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও এক রকম বন্ধ থাকিল। তাঁহাকে এরূপ ব্যবস্থায় কিন্তু খুব অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। তাৎকালিক সুন্দর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গুণে অল্পকাল মধ্যেই রামানন্দ বাবু এই মানসিক ব্যাধি হইতে বিশেষরূপ আরোগ্য লাভ করিলেন। বন্ধুর নানারূপ উপদেশ ও প্রবোধবচনে অনেকটা প্রবুদ্ধ হইয়া অসময়ে যখন-তখন যেখানে-সেখানে তিনি দুশ্চিন্তামগ্ন থাকিতেন না। যদিও মনে কোনো কিছু থাকিত, বাহ্যিক ভাব দর্শনে কেহ সহজে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে একেবারে চিন্তাশূন্য ছিলেন, এমন বলা যায় না। অবস্থা আর কারণ বিশেষে অনেক সময়ে মানুষকে ধীর গম্ভীর প্রতীয়মান করে—ঠিক যেন প্রবল ঝটিকাগমনের পূর্ব্বে নিষ্কম্প বৃক্ষ বল্লরী, অথবা জনপদবিধ্বস্তকারী প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশান্ত আগ্নেয় গিরি! ফলাফলে সত্য মিথ্যা ভ্রান্তি জানা যায় মাত্র!

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম উচ্ছ্বাস—আমোদ প্রমোদে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র কুমার শম্ভুচন্দ্রের প্রথমজাত তনয়ের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আ'জ্ কা'ল্ বড় ধূম। একেতো হিন্দুমতে অনুষ্ঠেয় সকল কাজেই রাজবাড়ীতে বরাবর অসম্ভব ধূমধাম হইত। তাহাতে এবার বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদার এবং ভূস্বামিনীগণ রাজবাটীতে অতিথিরূপে অবস্থিত থাকায় এই শুভ-কর্ম্ম উপলক্ষে মহারাজ মুক্ত-হস্ত—ঠিক যেন কল্পতরু—এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিকট বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গ, যাঁহারা বাসস্থলের দূরত্ব হেতু, সুযোগ বা সাবকাশ অভাবে, ইতিপূর্ব্বে কখনো কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই শুভ-কার্য্য উপলক্ষে আহূত হইয়া রাজবাটীতে অথবা তৎপার্শ্বে-নব-নির্ম্মিত গৃহে বা পট-মণ্ডপে, কেহ কেহ বা ইচ্ছানুসারে নৌকায়, অবস্থান করিতেছেন। এই সকল অতিথিজনের সর্ব্ববিধ সুখ সুবিধার ভার মহারাজা রামানন্দ বাবুর ও তৎসহকারী ধীরেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। রামানন্দ নামে অধ্যক্ষ হইলেও ধীরেন্দ্রনাথ কাজে বটে। রামানন্দ বাবু এখন উত্তমরূপ সুস্থ এবং সবলকায় হইয়াছেন। যাহাতে

নানারকমে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি আগেকার মতন সাংসারিক কাজে লিপ্ত হন, যশো-লিপ্সু হইয়া সমস্ত ভার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন, মহারাজার ইহাই যেন পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা। কতকাংশে এ চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

শুভদিন শুভক্ষণে অন্নপ্রাশন ও তদানুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সুসম্পন্ন হইলে নাচ, গান, তর্জ্জা, কবি, কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি তৎকাল-প্রচলিত বিস্তর আমোদ প্রমোদে সপ্তাহাধিককাল যাপিত হইল। এসকল শেষ হইলে পরে কি হইবে, পরামর্শ জন্য এক ক্ষুদ্র মন্ত্রি-সভা আহূত হইল। বর্ণিত সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভায় অনেক শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কৃত-পারদর্শী পণ্ডিত—কেহ বা বৃত্তিভোগী, কেহ নিষ্কর জমির উপসত্ত্বে সন্তুষ্ট, কেহ কেহ বা টোল চতুষ্পাঠী পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া রাজসাহায্যলাভে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল স্থানীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমন্ত্রিত বিদেশাগত বহু জ্ঞানী মানী বিদ্বান বিবুধগণের শাস্ত্র বিচার এবং জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ অন্তে পারিতোষিক বিতরণ অথবা অবস্থা বোধে বেশী বিদায়দান, সমাগত জমিদারগণের তত্ত্বাবধানে ইতিপূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। যে সকল পণ্ডিতের সত্বর-গমনের বিশেষ প্রয়োজন, বা, একবারেই থাকিবার যো ছিল না, তাঁহাদের অনেকেই পাথেয় লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন— অন্যেরা নবদ্বীপ প্রভৃতি সন্নিকটস্থ তীর্থ-ভূমির মায়ায় মুগ্ধ থাকিয়া

তত্তৎস্থানে যাতায়াত বা অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর ক্রিয়া কলাপ সমাপন হইয়াও যেন হইতেছে না; বুঝি বা শেষ হওয়াও মহারাজের ইচ্ছা নয়।

বাঙ্গালার প্রাচীন-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় জানেন যে, উজ্জয়িনীরাজ সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের তিরোধানের পর, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতন বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহদাতা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় দেখা যাইত না। বিক্রমাদিত্য রাজার সভায় কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি নানা বিদ্যাবিশারদ নয়জন কবি "নবরত্ন" উপাধিতে অলঙ্কৃত থাকিয়া সংস্কৃত-বিদ্যায় ভারতের তৎকালীন যশঃপ্রভা যেরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, যে গৌরব দৃঢ়মূল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে, বহুজাতির বিবিধ অত্যাচারেও, এতদিন অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে; রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রাজ-উৎসাহে উৎসাহী অনেক পণ্ডিতজন সেইরূপ নানামতে মাতৃভাষা বাঙ্গালার কলেবর পুষ্টকরণে বিশেষ খ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "পঞ্চরত্ন" সভায় পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি রাজ-গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে আপনাদের অক্ষয়কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া অমরত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন। এখনকার ভাষাতত্ত্বজ্ঞ অনেকের স্থির বিশ্বাস, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এতাবৎ দৃঢ় যত্ন বা উৎসাহদান তথা অর্থব্যয়-প্রবৃত্তি না থাকিলে বঙ্গভাষা এত শীঘ্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। মহারাজ উপাধিধারী এই জমিদার তান্ত্রিক মতাবলম্বী শাক্ত বলিয়া যে বিশেষ বিখ্যাত তাহাও

সকলের পরিজ্ঞাত। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় যে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, দু-একখানা ছাড়া তাহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্বন্ধে লিখিত এবং প্রাকৃত ও মৈথিলী ভাষা-মিশ্রিত বলিয়া স্থানে স্থানে কতক কতক দুর্ব্বোধ্য। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্যগণ এই সকল গ্রন্থকর্ত্তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে তদীয় তত্ত্বাবধানে প্রণীত গ্রন্থ সকলের অধিকাংশই শক্তি সম্বন্ধীয় এবং তাহাদের ভাষা তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত ও যাবনিক শব্দমিশ্রিত, স্থানে স্থানে লেখকের বা রচয়িতার উর্দ্দু, হিন্দী, পারসীক এবং সংস্কৃত বিদ্যায় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক! পাঠক পাঠিকারা সে সময়ের লিখিত প্রাচীন কবিগণের কবিতা ও অন্যান্য পুস্তকপাঠে এ সকল বাক্যের সার্থকতা সুন্দররূপ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা এ স্থলে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিলাম না; যতটুকু বলিবার প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র বলিলাম।

কৃষ্ণনগরের রাজসভার এই পাঁচ সাত বিজ্ঞ বিদ্বজ্জন মধ্যে তিনজন আবার বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। হাস্যরস-পটু লোক-রঞ্জক গোপাল ভাঁড়ের নাম ও তৎসম্বন্ধে নানারূপ গল্প গুজবের কথা বাঙ্গালার কে না জানেন? এই বিখ্যাত ভাঁড়ের বাক্‌-কৌশলে ও চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা কিরূপে অসম্ভব করদায়ে কারাবদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ঋণমুক্ত করিয়া সসম্মানে ছাড়িয়া দেন, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত নয়। রাজবাটীর আবাল

বৃদ্ধ বণিতা ছাড়া কৃষ্ণনগর সমাজের সকলেই গোপালকে অতিশয় ভালবাসিত বলিয়া মহারাজ এই প্রিয়পাত্রকে "রসিকবর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া নিজের পার্শ্বচর করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, গোপাল ভাঁড়ের বংশের কেহ কেহ এখনো জীবিত থাকিয়া মহারাজের অকাতরে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির উপসত্ব ভোগ-দখল করিতেছে। ফলতঃ, শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে তদ্দিতর বিবিধবর্ণের লোক অনেক প্রকারে কৃষ্ণনগরের প্রসাদভোগী ছিল এবং এখনো আছে, পশ্চিম বাঙ্গালার বিস্তর জেলায় ও গ্রামে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বাল্যকালাবধি "প্রায় যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান" নামক প্রবাদ-বাক্য শুনিয়া আসিতেছি। হয়তো এই সূত্রেই মহারাজার নাম প্রথম শুনি এবং পরিচয়ে সবিশেষ জানিতে পারি এমনো মনে পড়ে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৈনিক সহচর ও প্রধান প্রিয়পাত্র ভারতচন্দ্র রায় পাঠ্য-সমাজের এত সুপরিচিত, যে, এস্থলে তাঁহার বংশাবলির বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। ভারতচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁহাকে "রায়গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া ভরণ পোষণ উপযোগী মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। রাজার প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য তদীয় বংশাবলীর গুণকীর্ত্তন ছলে ভারতচন্দ্রের চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে "অন্নদামঙ্গল" নামে বিখ্যাত গ্রন্থ এবং মহারাজার ইচ্ছানুক্রমে পরে "বিদ্যাসুন্দর" ও

অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তা ছাড়া অপ্রকাশিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে।

সাধকশ্রেষ্ঠ কবিবর রামপ্রসাদ সেনের নাম উল্লেখ না করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিষয়ে ইতিহাস এক রকম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের মত ইনি মহারাজের নিত্য-সহচর না হইলেও এবং বয়সে ১০।১২ বৎসরের ছোট হওয়া স্বত্বেও গুণাংশে ও আদরে কিন্তু বড় কম ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের রচনার কিছু পূর্ব্বে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও "বিদ্যাসুন্দর" নামক সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থের কোনো স্থলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কোনোরূপ নামোল্লেখ রূপ ভণিতা বা গুণ-বর্ণনা দেখা যায় না। কবিরঞ্জনের "প্রসাদ পদাবলী" বা অসংখ্য শ্যামাসঙ্গীত তাঁহার ভুবন-বিখ্যাত কীর্ত্তিস্তম্ভ। প্রায় দুইশত বৎসর অগ্রে রচিত এই সকল গানের অদ্যাপি কেহই সমকক্ষ হইতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে পারিবে কিনা সন্দেহ, এরূপ কথা, বোধ করি, অত্যুক্তি নয়। কি অপূর্ব্ব কবিত্ব, কি মধুর ভাব, কি প্রগাঢ় ঈশ্বর-প্রেম, কতদৃঢ় আত্ম-নির্ভরতা এই সকল গানের প্রতিপদে বিস্ফুরিত। কথিত আছে, কবিরঞ্জন নানা বিষয়ে লক্ষাধিক গীত রচনা করিয়াছিলেন! কিন্তু এ সকলের অধিক অংশ এক্ষণে একরূপ দুষ্প্রাপ্য। রামপ্রসাদের "কালীকীর্ত্তন," "কৃষ্ণকীর্ত্তন," "শিবকীর্ত্তন," "সীতা বিলাপ" প্রভৃতি রচনাও বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব রত্ন। যতদিন কবির ও

কবিতার আদর থাকিবে, ভারতচন্দ্রের ও রামপ্রসাদের নাম সাহিত্য-জগতে কেহ ভুলিবেন না, ইহা অকাট্য সত্য।

বয়সের এইরূপ ন্যূনাধিক্য সত্ত্বেও রায়গুণাকর ও কবিরঞ্জন উভয়ে সম-সাময়িক কবি। কিন্তু গুণের তারতম্য অনুসারে দুজনের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, ইহা জানিবার বাসনা বহুদিনাবধি মনে মনে বলবতী থাকিলেও মহারাজ বাক্যে বা কার্য্যে এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ করেন নাই। কবিরঞ্জন এত ধীর, নম্র-প্রকৃতি অথচ বাহ্যিক উদাস-মনা ছিলেন, যে তদীয় আচরণে, রায়গুণাকর দূরের কথা, রাজবাটীর সামান্য একজন পরিচারক পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট কখনো অসম্মানিত হয় নাই। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া জোড়হস্তে ভারতচন্দ্রকে প্রণাম করিতেন এবং ভারতই যেন তাঁর শিক্ষাগুরু এমনি শিষ্টভাবে তাঁহার আদর যত্ন করিতে ত্রুটী দেখাইতেন না। এরূপ স্থলে মহারাজের পরীক্ষার চেষ্টা যে বিফল হইবে আশ্চর্য্য কি? তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুচতুর গোপালভাঁড় কিন্তু ইঙ্গিতে আভাসে এ কথা জানিয়া কোনো একটা শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজপৌত্রের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত অন্যান্য পাঁচজনের মত কবিরঞ্জন এ সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া উৎসব ও আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে ত্রুটী করেন নাই।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত "চণ্ডিপুর" নিবাসী বৃদ্ধ যোগী ও তৎসঙ্গে সপুত্র এক রমণীর কৃষ্ণনগরে আগমন ও অবস্থানের কথা ইত্যগ্রে

বলা হইয়াছে। "রতনে রতন মিলে" কথা সার্থক করার জন্য বুঝি সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জনের এবং এই যোগীর অল্প দিন মধ্যেই এত ঘনিষ্টতা হইয়াছিল, যে, কবিরঞ্জন প্রায়ই যোগীর বাসস্থান নৌকায় দিনের মধ্যে দুচারবার যাতায়াত এবং অবস্থান করিতেন। ক্রমে প্রসাদের মুখে বালকের গুণের বিশেষ পরিচয় প্রচারিত হইলে একদিন তাহাকে পরীক্ষা করা জন্য যোগীবরের সম্মতিক্রমে মহারাজ কর্ত্তৃক এক মহতী সভা আহূত হইল। নগরে উপস্থিত সকলেই এই আমোদজনক নূতন ঘটনা দর্শনে উৎসুক হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে দলে দলে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। ফলে এই সংমিলন যেমন অভিনব, তেমনিই অলৌকিক হইয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস—গুণ সংমিলনে।

পৌত্রের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নানা প্রকার উৎসব আমোদের শেষ ব্যাপার বলিয়াই যেন কৃষ্ণনগর রাজভবনে এদিনে এত উদ্যোগ আয়োজন, সাজসজ্জা, পূজা-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নানাশ্রেণীর অশেষবিধ লোকের বসিবার উচু নীচু আসন, চারিদিক্ লতা-পাতা-পুষ্প-পতাকা প্রভৃতিতে সুন্দর শোভমান। নিজ নিজ পদোচিত বেশভূষা-অস্ত্রশস্ত্রধারী আশাবরদার, চোপদার, বরকন্দাজ, পাইক, পেয়াদা, হরকরা, খানসামা, সেপাহী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর ভৃত্যবর্গ সাবধানে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত। অন্তঃপুরের সম্মুখভাগে সুদৃশ্য রেশমি পর্দ্দার অন্তরালে, মহারাণীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে, আমন্ত্রিত অশেষবিধ শ্রেণীর রমণীগণ উপবিষ্ট। বহির্ভাগে উচ্চ অট্টালিকার শীর্ষদেশ হইতে নানা রাগরাগিণীতে বাদিত নহবত-ধ্বনি আহূত শ্রোতৃবর্গের কর্ণসুখ প্রদান করিতেছে। ক্রমে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, মহারাজ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গ যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে, উপর্য্যুপরি তিনবার উচ্চ তূর্য্যধ্বনি হইল। শেষধ্বনি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইতে না হইতে, বিচিত্র গৈরিক-বেশধারী অতীব সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি একটী বালক ধীরে ধীরে রঙ্গস্থলে আগমন করিল। তাহার বেশভূষা, আকৃতি, সুন্দর ধীর গতি প্রভৃতি দৃষ্টে সমবেত দর্শকমণ্ডলী উচ্চ জয়ধ্বনি ও ঘন ঘন করতালি সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিল। বালক যেন পূর্ব্ব হইতেই উত্তম শিক্ষিত,

এমনি ভাবে প্রথমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে, পরে সমাগত সম্ভ্রান্ত জনবর্গকে, সাদরে অভিবাদন করিলে মহারাজের ইঙ্গিত ক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সমাগত সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনগণ এবং রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এই বালকটী সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশসম্ভূত, স্নেহে ও যত্নে শিক্ষিত, অল্প বয়সেই কবিতা-গীত রচনায় এবং সংগীত-বিদ্যায় বিশিষ্ট পারদর্শী, মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক যত্নে এবং অনুরোধে সমবেত জনগণের তুষ্টিসাধন জন্য অত্রাগত। সকলের অনুমতি হইলে সুর-সংযোগে দুই একটী নবরচিত গীত গাহিয়া সকলের সন্তোষ সাধন করে। বলা বাহুল্য, সমবেত জনমণ্ডলী আহ্লাদপূর্ব্বক উচ্চরবে কবিরঞ্জনের বাক্যের সমর্থন ও অনুমোদন করিতে লাগিল।

জন-কোলাহল ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলে মহারাজার আদেশ-মতে জনৈক পরিচারক একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র বীণা-যন্ত্র আনিয়া বালকের হস্তে দিল। তখন বালক বীণা-সংযোগে সুর তান লয় শুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম তথা তত্ত্ব-বিষয়ক নিম্নলিখিত দুইটী গানে সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিল।

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে জানাব সখি, কৃষ্ণে কত ভালবাসি।
কৃষ্ণ মোর প্রাণসখা, আমি কৃষ্ণ প্রেমদাসী।
কৃষ্ণনাম মনে হ'লে, ভাসি প্রেম অশ্রুজলে,
হেন বুঝি সব ফেলে, বসি তাঁর বামে আসি! ১।

আরো কত সাধ করে, বলি তাঁর গলা ধ'রে,
আমারে এমন ক'রে রেখে হ'য়োনা প্রবাসী। ২।
(সখি) তা বুঝি হবার নয়, গোলাপ কণ্টকময়,
প্রেমেতে বিচ্ছেদ হয়, বিধাতা তাতে প্রয়াসী। ৩।

রাগিণী খাম্বাজ বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

কেনরে মন-ভ্রমরা মত্ত বিষয়-মধুপানে।
জাননা তা "য়" ছাড়া, শুধু কেবল মন-মাতানে!
দারা সুতাসুতগণ, জড়ায় শুধু অকারণ,
ছিঁড়ে পাখা মধুমাখা, ফেলে দেয় শেষে টেনে!
হ'য়ে মোহে অতি-মত্ত, ভাব বিষয় সারতত্ত্ব,
অতি অসার কহি সত্য, বুঝে দেখ নিজ জ্ঞানে।
সকলি মায়ের খেলা, সাজায়ে মোহন মেলা,
হাসিছেন শৈলবালা, চেয়ে ওই তোমা পানে।
দেখ ভ্রান্ত! চক্ষু মেলি, সুখ-মধু দূরে ফেলি,
পিয় পাদপদ্মসুধা, ভাবি গুরুদত্ত ধনে!
এসেছ একলা ভবে, কাঁদি শুধু ট্যাঁ ট্যাঁ রবে,
সেই কাঁদা সঙ্গে রবে, যতদিন দেহ-ভবনে।
কথা বলি শুন সার, ভাব সেই সারাৎসার,
এ সংসারে কেহ কার, নহে আপনে আপনে;
কুমারের এই আশ, মুক্ত হয় ভবপাশ,
ডাকিতে তাঁহারে শ্বাস থাকে যন(?)

উচ্চ ধন্য ধন্য রবে রঙ্গস্থল এমন পরিপূর্ণ হইল, যে, শেষের সঙ্গীতটী সকলের ভালরূপে শোনা ঘটে নাই। তখন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বালক তৎসমীপে আনীত হইলে, কবিরঞ্জন সাদরে একছড়া সুন্দর মুক্তামালা তাহার গলে পরাইতে গেলেন। কিন্তু সুবুদ্ধি বালক মালা গ্রহণ না করিয়া বিনয়-নম্রতা সহকারে মহারাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল "রাজাধিরাজ! আপনারা সকলে অদ্য এইমাত্র যে কয়টী গান শুনিলেন, তাহা আমার জন্ম-দুঃখিনী জননীর রচিত—আমার কৃত নয়। মাদৃশ সামান্য বালক দ্বারা এরূপ ধরণের রচনা কদাচ সম্ভব নয়, তাহা বুঝিতেই পারেন। সভা মধ্যে এত লোকের সম্মুখে মাতা আসিবেন না বলিয়াই আমি তৎস্থানীয় স্বরূপে তাঁহার রচিত গীত গাহিয়া শুনাইলাম। পুরস্কার তাঁহারই প্রাপ্য। গীত শ্রবণে আপনারা যে অসন্তুষ্ট হন নাই ইহাই পরম লাভ।"

ইহার পর আর কেহ বালককে রাজ-সভায় দেখিতে পাইল না। উচ্চ জয়ধ্বনির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইতে হইতে, অন্যের অগোচরে, বালক কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে দিনের মত রাজসভা ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস—কবিতা-যুদ্ধে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুই জনেই তৎসময়ের পূজ্য শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও, গুণের তারতম্য অনুসারে, কে অপেক্ষাকৃত প্রধান, এটী জানিবার উপায় ইত্যগ্রে কোনোমতে ঘটে নাই। অথচ রাজাজ্ঞানুসারে গোপাল ভাঁড় বরাবর তৎসুযোগ অনুসন্ধানের চেষ্টায় ছিল, এ কথা প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে। বালকের পরীক্ষার পরদিনে কি উৎসব করা যায় সমিতিতে এই কথার জল্পনা সময়ে গোপাল প্রস্তাব করিল যে, এই শুভ সংমিলন উপলক্ষে চিরদিনের সেই মনোভিলাষ পূর্ণ হউক। কিন্তু কবিরঞ্জন রায় গুণাকরকে গুরুর অধিক মান্য করিতেন বলিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অনন্যগতি হইয়া বিজ্ঞপ্রধান রাজা নবকৃষ্ণ এইরূপ পরামর্শ দিলেন "যেরূপ দেখাশুনা গেল, তাহাতে বালকের মাতা—যিনিই হউন—একজন ভাবুক ও কবি। ইঁহাতে বিশেষ গুণপনা আছে। ইঁহার সহিত একে একে এই দুই কবিবরের রচিত 'কবিতার লড়াই' হউক। তাহাতে সুধু এই দুই জীবিত গুণীর উৎকর্ষাপকর্ষতা নয়, সংঘর্ষ-ফলে অন্যারও গুণাগুণ আরো বুঝা যাইবে। দেখা যাইতেছে যে, পণ্ডিতেরা প্রথিত-যশা, স্ত্রীকবি অজ্ঞাত-নামা সুধু এই মাত্র প্রভেদ।" এই ন্যায্য ব্যবস্থা সর্ব্ববাদী-সম্মত হইলে পরদিন কার্য্যে পরিণত হইবে এইরূপ ধার্য্য হইল এবং গোপালের উপরেই সকল ভার পড়িল।

পরদিনও ঠিক পূর্ব্বের মত সভা আহূত হইলে মহারাজ-প্রমুখ ভূস্বামী ও পণ্ডিতবৃন্দের আসনের একদিকে রায় গুণাকরের, অপর দিকে কবিরঞ্জনের, বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহাদের উভয়ের সঙ্গে একদিনে একই সময়ে একজনের বাক্-যুদ্ধ সম্ভবপর নয় বলিয়া পরীক্ষার দিন পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্ধারিত হইল। প্রথমেই বয়োবৃদ্ধ রায় গুণাকর লড়াইয়ের আসর গ্রহণ করিলেন। এখনকার মতন সেকালে মুদ্রাযন্ত্রের কোনো সুগম উপায় না থাকাতে একজন শ্রুতিধর পণ্ডিত উভয়ের প্রশ্ন ও উত্তর-জ্ঞাপক রচনা যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বদিনের মত, সুদৃশ্য অপর এক প্রস্ত গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, নিজ মাতার সহকারীরূপে বালক যবনিকার সমীপে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইল। ভিতরে মহারাণীদ্বয় এবং তাঁহাদের দুএকজন বিশ্বস্ত পরিচারিকা ছাড়া আর কেহ থাকিতে পাইল না। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন-কাল পর্য্যন্ত এই অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন ঘটনা দেখিতে যে কত শত সহস্র দর্শকবৃন্দ ও অন্তঃপুরচারিণীগণ যাতায়াত করিত, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অথচ সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলায় ও অবাধে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পাঠের সৌকর্য্য জন্য প্রথমে এক এক জন কবির, পরে রচয়িত্রীর রচনা যথাক্রমে বিনিবেশিত হইল। প্রশ্ন এবং উত্তরে, গানের রচনা শেষ হইলেই তখনকার প্রথানুসারে যথোচিত বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে তান-লয়-শুদ্ধ-ভাবে গীত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের

মনোহরণ ও উচ্চ জয়ধ্বনি আকর্ষণ করিয়াছিল, রামানন্দ-নিরুপমার ইতিহাসে এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে রচিত গীত ও কবিতা সকল মিশ্রিতভাবে উভয় কবির গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এত সুদীর্ঘ কালের পর ভিন্নভাবে সে সকলের নির্ব্বাচন সুকঠিন। অধিকাংশ এক্ষণে অপ্রাপ্য। বালকের মাতৃ-রচিত গানও এক্ষণে প্রায় অপ্রাপ্য। এই পুস্তক-পাঠকপাঠিকাগণের অবগতি জন্য প্রত্যেকের দুএকটা লিখিত হইল মাত্র।

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা মহারাণী দ্বয়ের বিশেষ অনুরোধে বালকের মাতা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্থাপিত কৃষ্ণনগরস্থ পদ্মাসনোপবিষ্ট কালী-মূর্ত্তির রূপ এবং শ্রীবৃন্দাবন বর্ণন চ্ছলে যে দুইটী গান রচনা করিলেন, তৎপুত্র কর্ত্তৃক সেইদিনের সভায় এ দুইটীও গীত হইলে সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

হরগৌরীরূপ (ভারতচন্দ্র রচিত)।

কি এ নিরুপম, শোভা মনোরম, হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীতকায়, রাঙ্গা দুটী পায়, নিছনি লইয়া মরিরে॥
আধ জটাম্বর সুন্দর সাজে, আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণিফণা ধরিরে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজলা,
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরীরে।

এক হাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বুল পূরিরে।
ভাঙ্গে ঢুলুঢুলু এক লোচন, কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধভাল হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দুর পুরিরে।
কপাল লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে. হইল প্রণয় করিরে।
দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরীরে।
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল, এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীরে।
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়,
হরগৌরীরূপ বর্ণন সায়, সবে বল হরি হরিরে।

হরগৌরীরূপ (ভারতচন্দ্রের রচনার উত্তরে বালকের মাতৃরচিত)।

প্রকৃতি পুরুষবর, নিরুপম গুণধর, কিবা রূপ একাঙ্গে মিলন।
কস্তুরী চন্দন মাখা, শ্মশানের ভস্মরেখা, দুইভিতে সুন্দর শোভন॥
আধ শিরে ফণিজটা, চিকণ কুন্তল ঘটা, কবরীতে অন্যে শোভা পায়।
দুই ভালে আধাশশী, সৌন্দর্য্য সাগরে পশি, মিলে, ধরে পূর্ণ রশ্মি ভায়
দিব্য মণিকুণ্ডল, বামকর্ণে ঝলমল, উরগ ভূষণ অপরেতে।
দক্ষিণেতে হাড়মাল, বামগলে মুক্ত জাল, কপাল মিলিত পরিজাতে॥

অর্দ্ধ কণ্ঠে নীল আভা, অন্যে চন্দ্র-কর-বিভা, মিশে বুঝি অমৃতে গরল।
ফণির বলয় বাম্যে, মণির কঙ্কণ বামে, ধরে শুভ্র কর নিরমল॥
আধমুখে ভাং ধুতুরা, অপরে তাম্বূল পুরা, দুই রসে ভিন্ন আস্বাদন।
বাঘছাল এক অঙ্গে, নীলাম্বর তার সঙ্গে, সাপে বাঁধা কটি আচ্ছাদন॥
সোণার নূপুর পায়, কি মধুর ধ্বনি তায়, কিন্তু সুধু বামপদে কেন?
দক্ষিণে সাপের ফণা, ফোঁস ফোঁস যায় শোনা, সাগর গঙ্গায় মিলে যেন॥
হরিতালে ব্যঙ্গ করি, সুবর্ণের বর্ণ ধরি, বাম অঙ্গ শোভা পায় কিবা।
কর্পূর ধবলকায়, বামেতর শোভা পায়, অপূর্ব্ব মিলন শিব শিবা॥
যুগলরূপের ঘটা, শুভ্রমেঘ বিদ্যুৎচ্ছটা, দিব্যচক্ষে করে যে দর্শন।
কত তার ভাগ্যফল, লিখনে নাহিক ফল, বুঝে দেখ ভাবুক সুজন॥

(কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ রচিত গীত)।

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা ক'রেছ কি?
নামে জগচ্চিন্তাহরা কিন্তু কাজে কৈ মা তেমন দেখি?
প্রভাতে দাও অর্থচিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠরচিন্তা,
সায়াহ্নে অলস-চিন্তা, বল মা তোমায় কখন ডাকি?
দিয়েছ এক মায়া চিন্তে, ওমা সদাই করি সেই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিন্তে, মা চিন্তাকূপে ডুবে থাকি।
ওমা তুই গো পাষাণের মেয়ে, পরম চিন্তাময়ী হয়ে,
রহিলি পাষাণী হ'য়ে, রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি!

কবিরঞ্জন কৃত গানের উত্তর (বালকের মাতৃরচিত)।

কিসে মন আশা কর তারার্ চিন্তা-স্থান হবে?
জাননা—তোমার মত কত জীব আছে ভবে?
সত্য বটে মায়াবলে, সৃজন করি সকলে,
পালিছেন স্থলে জলে, বিহঙ্গ কীট মানবে।
সৃজন পালন লয়, তাঁহারি ইচ্ছাতে হয়,
যে তাঁরে পাষাণী কয়, কলঙ্ক তাহারি রবে।
কেহ জানে দয়াময়ী, কেহ সদানন্দময়ী,
ফাকিতে পড়িবে সেই, যে তাঁহারে কটু কবে!
কুমার কয় কিসের চিন্তে, মাকে যদি পায় চিন্‌তে,
দূরে যাবে সর্ব্বচিন্তে, চিন্তামযী মা কোলে লবে!

চতুর্থ উচ্ছ্বাস—বিদেশগমনে।

এই সকল গোলযোগে রামানন্দ রায় কি করিতেছিলেন তাহা বলার সময় ঘটে নাই। তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে সংলিপ্ত করার মানসে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমাগত অতিথিগণের সকল রকম সুখ সুবিধার এবং পরিচর্য্যার ভার তৎহস্তে সমর্পণ করেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাকে কয়দিন সর্ব্বদাই রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। সুতরাং তথায় অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ দেখাশুনার প্রচুর সুযোগ যে তাঁহার ঘটিত, তাহা স্বতঃই অনুমিত হয়। অন্যান্য প্রধানগণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট তিনি এই সকল কবি-যুদ্ধ বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বিশেষতঃ একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিচিত্র-বেশধারী বিদেশী বালককে প্রথম দর্শনাবধি তাহার মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ও স্নেহরসে বরাবর আপ্লুত হইত। বালক দৃষ্টিপথে থাকিতে তিনি অন্য কোনো দিকে চাহিতেন না; অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া নির্নিমেষ লোচনে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পানে চাহিয়া গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। আবার, বালকের নিজ মাতৃ-রচনা পাঠ করার সময়ে রামানন্দবাবুর অন্য সর্ব্ব ইন্দ্রিয় যেন কেবল শ্রুতিপথের আশ্রয় গ্রহণ করিত; তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া কেবলই তাহার সুমধুর ভাষার উচ্চারণ শুনিতেন। স্বাভাবিক উন্নতভাবে স্ফীত হইয়া বালক যখন গর্ব্বিত সিংহ-শিশুর ন্যায়

দাঁড়াইত, রামানন্দ রায়ের ভ্রম হইত, বুঝি বহুকালের পর পুনর্জ্জীবিত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামানন্দ সেই রাজসভায় ঐ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অথচ বালকের সঙ্গে তাঁহাদের বংশগত কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাহা তাঁহার কিছুই জানা ছিল না। কি কারণে, চুম্বকশলাকা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট লৌহের মতন এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটীর জন্য তাঁহার মন এতটা উতলা হইত তাহা তিনি কিছুই বুঝিতেন না; যেন তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত!

পরে যখন দেশ-প্রথিত কবিদিগের কবিতা রচনারূপ তথাকথিত সংগ্রামের অবসান হইল; যখন, মধ্যস্থগণের মীমাংসা-শ্রবণের পূর্ব্বেই জননী সহ বালক কৃষ্ণনগর রাজধানী হইতে এককালে অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হইল; যখন নানা চেষ্টায় ও যত্নে ভারপ্রাপ্ত রামানন্দ রায় পলায়িতদের কোনো সন্ধান পাইলেন না; যখন স্বয়ং মহারাজ বা তৎপত্নীপুত্রগণ বালক ও তন্মাতার বিশেষ কোনো পরিচয় অথবা তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা কিছুতেই দিতে পারিলেন না; কিম্বা হয়তো (রামানন্দের মতে) জানিয়া শুনিয়াও দিলেন না; তখন রামানন্দ বাবু আগেকার মতন আবার উন্মনা ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এবারে যেন পূর্ব্বভাব একটু বিশেষ রকম পরিবর্ত্তিত—আগে যেন কি খুঁজিতেছিলেন, পান নাই; এবারে যেন কি একটা জিনিষ পাইয়াই দৈবদোষে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং আগের চেয়ে এবারে দৈব-নিন্দা, আত্ম-গ্লানি, অনুতাপ

অনেক বেশী হইল ! ধীরেন্দ্র বাবু অন্য বিষয়ে বুদ্ধিমান এবং দক্ষ হইলেও এবারে কিন্তু তাঁহাকে কোনো বিশেষরূপ সাহায্য করিতে পারিলেন না।

ক্রমে তাঁহার অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর বেশীদিন রামানন্দ রায়কে রাজধানীতে রাখিতে সাহসী হইলেন না। তখনো ইংরেজ ফরাসি যুদ্ধের অবসান না হওয়াতে প্রস্তাবিত রাজস্ব-সম্বন্ধীয় মন্ত্রণা-সভা স্থগিদ্ ছিল। এজন্য অতিথি-গণের অনেকেই আর থাকিতে না পারিয়া স্ব স্ব অভিলষিত গন্তব্য-স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এদিকে রাজ-বৈদ্য মহাশয়ের ব্যবস্থা-মতে রামানন্দ বাবুর দীর্ঘকাল নৌকা-ভ্রমণ এবার চিকিৎসারূপে অনুমোদিত হইল। সুতরাং বিষয় আশয়ের সুবন্দোবস্ত করণে সপ্তাহ কাল মাত্র আনন্দপুরে থাকিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পুনরায় কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং যথোপযুক্ত অনুচরগণ সহ রামানন্দ বাবুকে লইয়া নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চল প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস—দম্পতি-মিলনে।

কিছুদিন পুণ্য-ভূমি কাশীধামে অবস্থিতির পর তথা হইতে বরাবর নৌকা-যোগে হরিদ্বার পর্য্যন্ত ভ্রমণের কথা একরকম ধার্য্য হইয়াছে। ইতোমধ্যে একদিন রামানন্দ বাবু, দেবাদিদেব কাশীশ্বরের সান্ধ্য-আরতি এবং তদন্তে "সিঙার" নামে তাঁহার অপূর্ব্ব পুষ্পবেশ দেখিবার মানসে মন্দিরে গিয়াছেন। বিশেষ কোনো প্রয়োজনে অন্যত্র গমন উপলক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ অদ্য রাত্রে বন্ধুর সহচর হইতে পারেন নাই। চৈত্রমাসের শুক্ল ত্রয়োদশী। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। তিনি মন্দিরের বাহিরে আসিবামাত্র অর্দ্ধবয়সী একটী মহারাষ্ট্র-রমণী তাঁহার হস্তে একখানি ক্ষুদ্র লিপি প্রদান করিল। নিজ নামের শিরোনামা দর্শনে রামানন্দ রায় অসঙ্কোচে উহা উন্মুক্ত করিলেন। পত্রখানি কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হস্ত-লিখিত। তাহার মর্ম্ম এই-রূপ :—আপনার কোনো পরিচিত ব্যক্তি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। তাঁহার আয়ুঃকাল ফুরাইয়াছে বোধ হয়। আপনার সঙ্গে তাঁহার শেষ দেখা শুনা একান্ত প্রার্থনীয়। আপনি কাশীধাম হইতে অন্যত্র গমনের অগ্রে একবার দেখা দিয়া ইঁহাকে কৃতার্থ করিবেন। ইচ্ছা এবং সুবিধা হইলে পত্র-বাহিকার সঙ্গে অদ্য রাত্রেই আসিতে পারেন। বিলম্বে কার্য্যহানি সম্ভাবনা। কিন্তু আপনাকে একটী বিশেষ অনুরোধ এই যে, ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসা ছাড়া ভদ্র-স্ত্রীলোকটীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। করিলেও উত্তর

পাইবেন কিনা সন্দেহ। কেননা, নিজের ভিন্ন অন্য কোনো ভাষ ইনি একেবারে বুঝেন না ইত্যাদি।

স্বাক্ষরশূন্য এই ক্ষুদ্র লিপিপ্রাপ্তে রামানন্দ বাবু প্রথমে বিস্মিত পরে ভীত, শেষে সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক নগরে—বিশেষতঃ বারাণসীধামে—এই রকম কোনো একটা ছলে নিমন্ত্রণ, পরে গুণ্ডা-নিয়োগে সর্ব্বস্ব অপহরণ—অনেক সময়ে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত—যে নিত্য ঘটনা, এটা তাঁর অজানা ছিল না কিন্তু অমন সুদূর প্রবাসে তাঁহার যে কোনো শত্রু আছে সেটা তিনি জানিতেন বা মানিতেন না। নানা কারণে তিনি এখন নিজ সম্বন্ধে এক রকম উদাসীন। ধনপ্রাণের মায়া এ সময়ে তাঁহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ। তাহার উপর কোনো আত্মীয় কঠিন পীড়াগ্রস্ত, পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে। সুতরাং প্রথম-জাত সামান্য সন্দেহ দূরে রাখিয়া তিনি সেই অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং উভয়েই নির্ব্বাক্‌ভাবে পথের পর পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

সহরের প্রায়-প্রান্তভাগে শ্মশান-ঘাটের উত্তর দিকে, এক ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকায় উভয়ে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ, তাহাদের অনেকগুলি ফল ফুল ভারে অবনত; পুষ্পের মধুর সুগন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ। ফলভারাবনত তরুনিচয় যেন বিভুগুণ গানে নিরত। পথশ্রান্ত রামানন্দ বাবু প্রবেশমাত্র মুহূর্ত্ত

মধ্যে বিগত-ক্লম হইলেন। উদ্যান-মধ্যস্থিত একখানি সুপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র গৃহদ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া সঙ্গের স্ত্রীলোকটী হস্ত-নির্দ্দেশে তাঁহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। ঠেলিবামাত্র আপনা হইতে দ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র দীপালোক কষ্টে স্বষ্টে গৃহের অন্ধকার দূর করিতেছিল। নিকটে পরিষ্কৃত মৃগচর্ম্মোপরি-উপবিষ্ট একজন প্রাচীন যোগী একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, আহূত রামানন্দ রায় গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি একখানি কুশাসন দেখাইয়া তাঁহাকে তদুপরি বসিতে বলিলেন। মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় রামানন্দ যোগীকে প্রণাম পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

মেঘগম্ভীর অথচ মিষ্টস্বরে বৃদ্ধ যোগী আনন্দপুরের জমিদারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি অবশ্য আমাদিগকে চিন না, তোমার সহচর ধীরেন্দ্রও জানেন না, অথচ কার্য্যসূত্রে দেখিতে পাইতেছ যে, আমরা উভয়কে বেশ চিনি। সুধু চেনা নয়। তোমার গতিবিধি ভাবগতিক পর্য্যন্ত আমাদের অগোচর নাই। কিসে, কেমন করিয়া, কাহার দ্বারা এ সব সংবাদ পাই, সে বৃত্তান্ত জানার প্রয়োজন নাই। এক সময়ে, সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে, আমি তোমাদের কতক পরিচিত ছিলাম। কেননা, আমার খুল্লতাত স্বর্গীয় গোলকনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় তোমাদের কুলগুরু ছিলেন। তাঁহার বংশ এখনো নিত্যানন্দপুরে বর্ত্তমান আছে, এবং তৎপৌত্র

মধ্যে মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করেন, ইহা অবশ্যই জান। পার্শ্বের এই ঘরে আমার কন্যাস্থানীয়া যে শিষ্যা আছেন, তিনি তোমার সুপরিচিত অর্থাৎ এককালে তিনি তোমার একজন আত্মীয় শ্রেণী মধ্যে গণ্যা ছিলেন। দৈব-দুর্ব্বিপাকে—অনেক দিনের অদর্শনে—তিনি একরকম 'পর' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ইনি কঠিন রোগগ্রস্ত হইলে নিজের সামান্য ক্ষমতা-বুদ্ধি-বলে আমি ইঁহার প্রাণরক্ষার উপলক্ষ্য হই। কিন্তু এবারে ইঁহার পীড়া একরকম দুরারোগ্য—অন্ততঃ আমা-কর্ত্তৃক তাহার প্রতীকার সম্ভব নয়। ইহা বুঝিয়া, যোগবলে আমার গুরুদেবের আদেশে, আমি ইঁহাকে এখানে আনিয়াছি। কাশীধামের একজন বিখ্যাত নিদানজ্ঞ চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু নানারূপ লক্ষণে আমরা দুজনেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যাধিই ইঁহাতে প্রবল। মনের সহিত মানবদেহের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পদে পদে উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। মানসিক ব্যাধি সকলের চিকিৎস্য নয়। তোমার দ্বারা ইঁহার মানসিক রোগের যদি কোনরূপ কিছু প্রতীকার হয় এই আশায়—একমাত্র শেষ উপায় স্বরূপ—তোমাকে কৌশলে অদ্য এখানে আনিলাম। তুমি এখন কাশীধামে উপস্থিত আছ এবং ডাকিলে আসিবে জানিয়া তাহার একান্ত ইচ্ছা একবার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করেন।

মধ্যে একবার অন্যত্র তোমাদের পরস্পরের দেখা হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। তখন দেখার প্রয়োজন না থাকায় এবং ধরা পড়ার ভয়ে, আমরা সে স্থযোগ ছাড়িয়া পলায়ন করি। আর অধিক বাক্য-ব্যয় করিব না। দেখিলে শুনিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবে।”

এই ভূমিকার পর, যোগীবর মৃদু মধুর স্বরে তিনবার “নয়নানন্দ” বলিয়া ডাকিলেন। শেষবার আহ্বানের পর পরম স্থন্দর এক বালক আসিয়া যোগীর সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইল এবং তাঁহার ইঙ্গিতে মুগ্ধ রামানন্দ বাবুকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিল। এই বালকের আকার ইঙ্গিতে বিস্মিত রামানন্দ রায়ের মনে হইল যেন ইত্যগ্রে কোথাও এই বালকটীকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু চিনি-চিনি করিয়াও কোথায়, কবে এবং কি সূত্রে, কিছুতেই তাহা মনে পড়িল না। মন্ত্র-মুগ্ধের মতন তিনি বালকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

একখানা জীর্ণ ক্ষুদ্র চারপায়ার উপর, কোমল পরিচ্ছন্ন শুভ্র শয্যায়, আস্তৃত স্থগন্ধি কুস্থমরাশি মধ্যে চিত্র-লিখিত পুত্তলীবৎ, জীর্ণ শীর্ণ এক রমণী মূর্ত্তি। ভাল করিয়া না দেখিলে, আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃত যুবতী এই রুগ্নাকে একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা বলিয়া মনে ভ্রম জন্মে। ভ্রমর-কৃষ্ণ স্থদীর্ঘ কেশপাশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে পতিত ; মৃণাল-নিন্দিত শিরীষ-কুস্থম-পেলব বাহুদ্বয় নিশ্চেষ্ট-ভাবে শয্যার উপরে রক্ষিত ; চন্দ্রকর-উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি, রাহুগ্রস্ত

শশীকলার ন্যায় মলিন ; অতুলনীয় পরম সুন্দর মুখমণ্ডল পাণ্ডুরবর্ণ ; আকর্ণ-বিস্তৃত মৃগ-চক্ষু দুটী যেন অস্তাচল-গমন-প্রয়াসী চন্দ্রমার মতন স্তিমিত-জ্যোতি ; কণ্ঠ-স্বর শ্রবণ-মনোহর, অথচ অতি মৃদু, যেন নব বসন্তাগমে ফুল্ল চূত-মুকুল-আস্বাদনে মধুরকণ্ঠ পিক-বধূ অনেকক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বালকের সঙ্গে গৃহপ্রবেশ করিয়া স্তিমিত-দীপালোকে এই জীর্ণশীর্ণ রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া রামানন্দ রায় চিনিতে পারিলেন না। সুতরাং কি প্রয়োজনে এই ব্যাধি-ক্লিষ্টা রমণীকে দেখিবার জন্য সেই নির্জ্জন গৃহে তথা-সময়ে এরূপভাবে আহূত হইলেন, প্রথমে কিছুতেই তাহা তাঁহার বোধগম্য হইল না। মাতার ইঙ্গিতমতে বালক নয়নানন্দ একখানি বসিবার চৌকি তন্নিকটে রাখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তখন অতি ধীরে, বাতান্দোলিত কদলী-বৃক্ষবৎ কম্পিতদেহে, অতিমাত্র কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া সেই রুগ্না রমণী গললগ্নীকৃতবাসে রামানন্দ বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। রামানন্দ রায় তো অবাক্! একে সেই রমণী অপরিচিতা, তাতে রুগ্না, তার উপর আবার ভূমিষ্ঠ প্রণতা! কে এই রমণী? আর এ সুন্দর বালকটীই বা কে? ইহারা তাঁহার এত খাতির যত্ন করে কেন? তিনি কি ইহার উপযুক্ত? কিন্তু এ সকল প্রশ্নের মৌখিক উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই রমণী যখন মৃদু মধুর স্বরে তাঁহার দৈহিক মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা সহ উপবেশন জন্য অনুরোধ

করিলেন, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে সন্দেহ, কৌতূহল, আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বিমিশ্র ভাব রামানন্দকে এককালে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি প্রকৃত পক্ষে নিদ্রিত কি জাগরিত, ইহজগতে কি অন্য কোনো লোকে নীত, দৃষ্ট ঘটনা সত্য কিম্বা অপ্রাকৃত, কিছুতেই তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন ভাবগতিক বুঝিয়া সেই মলিন-কান্তি রমণী ধীরে ধীরে নিজ বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি হইতে একটী পরম সুন্দর হীরকাঙ্গুরীয়ক উন্মোচিত করিয়া বিমুগ্ধ-চিত্ত রামানন্দের হস্তে দিলেন। উত্তমরূপে নিজ চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া রামানন্দ রায় সেই ক্ষীণ দীপালোকে পাঠ করিয়া দেখিলেন —হীরকের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন্ত অক্ষরে দুটী নাম খোদিত রহিয়াছে— নিরু—রাম

আর সন্দেহ রহিল না। রামানন্দ রমণীর দিকে চাহিয়া দেখেন, নানাভাবে মুগ্ধা তিনি মূর্চ্ছিতা। তখন পার্শ্বস্থ জলপাত্র হইতে শীতল বারি মুখে চক্ষে সিঞ্চন করিয়া বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নিজের মানসিক অবস্থাও যে সে সময়ে খুব ভাল ছিল, তাহা নয়। তথাপি, যেন কোনো অমানুষিক দৈববলে বলীয়ান হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর অতর্কিতভাবে সুদূর বিদেশে এই দম্পতি-মিলন সুখের কি কষ্টের কারণ হইল, উভয়েই প্রথমে তাহা বুঝিতে

পারিলেন না। বিচক্ষণ যোগী সকল দিক্ ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেও ক্ষীণ-দেহা দুর্ব্বল-মনা নিরুপমা এককালে প্রথম মিলনজাত আনন্দের বেগ সম্যক্‌রূপে সামলাইতে পারিলেন না। এটা স্বাভাবিক। প্রবল গ্রীষ্মের দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ-দ্রবীভূত তুষার-স্রোত যেমন জলরূপে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া মাঠ ঘাট সমস্ত জনপদ এককালে প্লাবিত করিয়া ফেলে, এ স্থলেও ঠিক তাহাই ঘটিল। বহুদর্শী বিজ্ঞ যোগী তৎক্ষণাৎ একটী বল-সঞ্চারক সুসেব্য ঔষধ সেবন করাইয়া দুর্ব্বল ক্ষীণকায় নিরুপমাকে অপেক্ষা-কৃত সবল করিলেন। আর বিভিন্ন-ভাব-মুগ্ধ রামানন্দ রায় যে স্বতঃই প্রবুদ্ধ হইলেন, লেখা বাহুল্য। যোগী এইরূপে সতর্কতাবলম্বন না করিলে এই আকস্মিক মিলনের ফল যে কতদূর বিষময় হইত তাহা বলা যায় না—হয়তো অতিরিক্ত আনন্দে নিরুপমার প্রাণান্তও ঘটিত।

এই মিলনের পর উভয়ের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম পাঠে সকলে অনেক কথা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া প্রয়োজন-মত আংশিকভাবে নিম্নে বিবৃত হইল। পরিত্যক্তা অভিমানিনী নিরুপমা গৃহত্যাগের রাত্রে আনন্দপুরের অদূরে নদীতীরবর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে কিরূপে হঠাৎ যোগীর সঙ্গলাভ করেন; কিরূপে তদনুগ্রহে তদাশ্রমে তাঁহার একটী সঙ্গিনী লাভ হয়; কিরূপে উভয়ের সাহায্যে কয়মাস পরে তিনি নিরাপদে এক পুত্র প্রসব

করেন। এবং প্রসবান্তে দারুণ শোকে ও চিন্তায় কঠিন রোগ-গ্রস্ত হন; তৎপরে যোগীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং আশ্চর্য্য চিকিৎসা-গুণে আরোগ্যলাভ করিয়া তৎসহ কয় বৎসর নানাদেশ-ভ্রমণে বিবিধ লোকের সংশ্রবে কিরূপে সঙ্গীত-বিদ্যা সহ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তিলাভ করেন; তাঁহার পুত্রটীও কিসে অল্পবয়সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়; কিরূপে নৌকা ভ্রমণ কালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনগর সমীপে নৌকায় কয়দিন বসবাস করিতে হয়; পরে কিরূপে পালক যোগী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ ও আদিষ্ট হইয়া রাজসভায় রাণী-মহলে উপস্থিত থাকেন এবং তাহার কি ফলাফল ঘটে; তৎপরেই ধরা পড়ার ভয়ে কাহাকেও না জানাইয়া তাঁহারা কি কৌশলে অন্যত্র পলায়ন করেন; সর্ব্বশেষে যেজন্য এই সকল গত ঘটনার বেগ সম্পূর্ণ সামলাইতে না পারিয়া পীড়িত ও এই নির্জ্জন দেশে রক্ষিত হইয়াছেন, নিরুপমা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে স্বল্প কথায় নিজ পতিকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অনুতপ্ত, স্ত্রীপুত্র-মায়ামুগ্ধ রামানন্দের জ্ঞান-চক্ষু যেন ক্রমশঃ উন্মীলিত হইল। ঘটনার যে যে অংশ নিরুপমার কথায় ভাল বুঝিতে পারিলেন না, যোগীর নিকট পরে তাহার মর্ম্ম জানিয়া তিনি হৃদয়ে অতীব ব্যথা পাইলেন।

উপসংহার।

আমাদের আখ্যায়িকা একরূপ শেষ হইয়াছে, কিন্তু আরম্ভের মত শেষ ভাগটাও অসম্পূর্ণ না থাকিয়া যায়, এজন্য আরো দু চার কথা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

কাশীধামে অভাবনীয় ও আশাতীতরূপে পতি-পত্নীর পুনর্ম্মিলন হইলে স্নিগ্ধজন মাত্রেই যে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, লেখা বাহুল্য। পীড়া শান্তির কথায় লোকে চলিত ভাষায় বলে "বাড়্‌তে তাল, ক'ম্‌তে তিল"। কিন্তু সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পতি সহ মিলিতা নিরুপমার রোগ কোন্ দিক্ দিয়া কিরূপে যে অন্তর্হিত হইল, সেটা কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না। এই অসম্ভব পরিবর্ত্তনে নিরুপমার আশ্রয়-দাতা যোগীবর সকলের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য হইলেন। নিরুপমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত-প্রায় বুঝিয়াই তিনি তাহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ জন্য ওরূপ ভাষায় পত্র লিখিয়া রামানন্দকে দেখা করিতে আনেন। কিন্তু সে ঘটনা যে সঞ্জীবনী মহৌষধি স্বরূপ তাঁহার আশ্রিতা ছাত্রীর প্রাণরক্ষা করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। মানব জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সৃষ্টিকর্ত্তা বৈ কে বুঝিতে পারে? মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা সকলে সম্যক্ জানেন না। সংসার-ত্যাগী অবিবাহিত যোগী-পুরুষ চণ্ডীপুরের জন কয়েক লোক এবং দু চার রকম গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ ছাড়া যে বেশী রকম জানিতেন না ইহা অস্বাভাবিক নয়।

কাশীধামে কিছুদিন অবস্থানে নিরুপমা লব্ধস্বাস্থ্য হইলে সকলে স্থানান্তর গমনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা থাকিলেও এ যাত্রা হরিদ্বার অবধি যাওয়া ঘটিল না। কেবল, রামানন্দের নিতান্ত আগ্রহে ও নিরুপমার ঐকান্তিক চেষ্টায় নৌকাযোগে প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল। সে বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, তাহার ইতিহাসও এক রকম দুষ্প্রাপ্য। তবে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে উপপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হৃত-সর্ব্বস্বা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা বিকৃত-দর্শনা মাধুরী যেরূপে তাঁহাদের নিকট প্রচুর অর্থ-ভিক্ষা পাইয়াছিল, চিরশত্রু সপত্নীরও পরিচয় পাইয়া তাহার কষ্ট এবং দুরবস্থা দর্শনে কোমলপ্রাণা নিরুপমা যেরূপ প্রকৃত দেবীর ন্যায় রোদন করিয়া নিকটবর্ত্তী নগরোপান্তস্থ এক আতুরাশ্রমে তাঁহাকে রাখিয়া আসেন এবং মধ্যে মধ্যে সুযোগ পাইলেই তাহার তত্ত্ব লইতে ক্রটী করিতেন না, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কোনোরূপে বহু কষ্টে পাওয়া গিয়াছে। ভগবানের অকাট্য ব্যবস্থায় পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি যে এ জগতেই সংঘটিত হইতে পারে, নিরুপমা-মাধুরীর শেষ জীবন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২)

দেশে প্রত্যাগমন সময়ে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে দেখা সাক্ষাৎ ও কয়দিন অবস্থান না করিয়া তাঁহারা আনন্দপুরে যাইতে

পারিলেন না। নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে অভাগিনী নিরুপমা যেরূপ ক্ষীণা ও মলিনা হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজপৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া আগেকার সেই অপূর্ব্বরূপিণী "মালিনা সুন্দরী" বলিয়া রাজবাটীর কেহই যে তাঁহাকে আদৌ চিনিতে পারেন নাই, এটা বড় আশ্চর্য্য নয়। সুতরাং কবিত্ব-শক্তিসম্পন্না বিদূষী রমণীর অপেক্ষা অধিক খাতির যত্ন তিনি যে তৎকালে পান নাই, শুনা যায়, সেজন্য মহারাণীরা ও অন্যান্য পরিজনবর্গ শেষে যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছিলেন। রাজবাটীতে "সেই ফুট্‌ফুটে ছেলেটী" নয়নানন্দের আদরের সীমা রহিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আশেষ বিশেষে, এবং যৌতুকস্বরূপ একটী সুন্দর নিষ্কর জমিদারী প্রদানে বালককে পুরস্কৃত করিয়া নিজের লোক-বিখ্যাত দাতৃত্ব-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বালক নয়নানন্দও পিতার ন্যায়, কৃষ্ণনগর রাজবংশের চির অনুগত সুহৃদ্ রূপে বরাবর সম্মানিত ছিল।

(৩)

এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরায়, আনন্দপুরের প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রগৃহের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। শুভ মিলন উপলক্ষে বহু দিন ধরিয়া নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল এবং আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাহূত অভ্যাগত জন-সংঘের আনন্দ-উৎসব-মুখরিত জমিদার-বাটী সমগ্র

আনন্দপুর গ্রাম খানিকে প্রকৃতই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন রাখিয়া নামের সার্থকতা সাধন করিয়াছিল এটা স্পষ্ট না লিখিলেও সকলেরই অনুমেয়। দেবীরূপিণী নিরুপমার সুন্দর স্বভাব-গুণে কয়েক বৎসর মধ্যে রামানন্দ রায়ের সংসারে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইল। পুত্রকে নিজের অপেক্ষাও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, বিবাহিত এবং কার্য্যক্ষম দেখিয়া বন্ধু ধীরেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সকলকে রাখিয়া সস্ত্রীক রামানন্দ অবশিষ্ট জীবন তীর্থবাস মানসে যাত্রা করিলেন। দুই জনে ভারতের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শনে, এবং শেষ জীবনে পবিত্র কাশীধামে বহুবৎসর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনায় তথা দান, ধ্যান, দেবমন্দির স্থাপনাদি পুণ্যকর্ম্মে, অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মোচিত যোগ্যধামে গমন করিয়াছিলেন, কীট-দষ্ট রায়-বংশের প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থে এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

